BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

ক্ষয়

॥ রুকু ॥

রুকু, আমার একটা প্রবলেমের কথা তোমাকে বলব?

বলবে? বলতে পারো। কিন্তু আমার নিজেরই অনেক প্রবলেম দয়ী।

দয়ী একটু হাসল টেলিফোনে। বলল, তোমার প্রবলেমের কথা আর একদিন হবে রুকু। সেদিন আমার কাঁধে মাথা রেখে কেঁদো। কিন্তু আজ আমারটা শোনো। ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম।

রুকু খুব সাবধানি গলায় বলে, শোনো দয়ী, যদি বলতেই হয় তবে রেখে-ঢেকে বোলো। এই টেলিফোন কিন্তু ডাইরেকট নয়। ইচ্ছে করলে অপারেটর শুনতে পারে। তা ছাড়া আমার তো এক্সক্লুসিভ টেলিফোন নেই। যার টেবিলে টেলিফোন সে এইমাত্র বাইরে গেল, যখন তখন এসে পড়তে পারে।

এগুলোই কি তোমার প্রবলেম রুকু?

এগুলোও। তবে আরও আছে। অনেক। গরিবদের যে কতরকম থাকে।

বাজে বোকো না। তুমি এক কাঁড়ি টাকা মাইনে পাও, আমি জানি।

আমার পে-স্লিপটা তোমাকে একদিন দেখাব। দেখো, সেখানেও কত প্রবলেম।

ইয়ার্কি বন্ধ করে একটু শুনবে? খুব জরুরি কথা।

শুনছি।

তুমি মলয়কে একটু বুঝিয়ে বলবে যে, ও যা চাইছে তা হয় না।

কী হয় না দয়ী?

তুমি জানো না বুঝি? মলয় তোমাকে কিছু বলেনি?

মলয়ের সঙ্গে আমার দেখাই হয় না প্রায়। কী হয়েছে?

ও আমাকে নিয়ে ভাবছে। অ্যান্ড হি ইজ সিরিয়াস।

একটু খুলে বলো। কিছু বুঝতে পারছি না।

তুমিই তো খোলাখুলি কথা বলতে বারণ করলে।

আই উইথড্র।

অপারেটর শুনছে না তো।

শুনুকগে। বলো।

মলয় ইজ বিয়িং প্রিমিটিভ।

তার মানে?

ও বোধহয় বিয়ে-টিয়ের কথা ভাবছে।

রুকু একটু চুপ করে থাকে, তারপর শান্ত ব্যথিত স্বরে বলে, ও।

শোনো রুকু, অত নিরাসক্তভাবে ব্যাপারটা নিয়ো না। একটু সিরিয়াস হও। ও বোধহয় সত্যিই আমার প্রেমে পড়েছে। আগের মতো হাসিখুশি ইয়ারবাজ নেই, দেখা হলেই গম্ভীর হয়ে যায়। ভাল করে তাকায় না।

সেটা কি প্রেমের লক্ষণ দয়ী? বরং উলটোটাই তো।

তোমাকে বলেছে।

তবে?

ও আমাকে লম্বা লম্বা চিঠি লেখে যে আজকাল। তাতে সব সেই বিয়ে-টিয়ের মতো সেকেলে বিষয় থাকে। আমি একটারও জবাব দিইনি।

দাওনি কেন?

বাঃ, চিঠি চালাচালির কী আছে বলো! প্রায়ই তো দেখা হচ্ছে। আমি একদিন ওর চিঠির প্রসঙ্গ তুলেছিলুম, ও গম্ভীরভাবে বলল চিঠির জবাব চিঠিতেই নাকি দিতে হবে। কী বোকামি বলো তো?

তুমি তো ওকে পছন্দই করতে দয়ী?

সে তো অনেককেই করি।

তুমি ওর সঙ্গে ধলভূমগড় বেড়াতে গিয়েছিলে। একবার কোনও ডাক-বাংলোয় ছিলেও দু'-একদিন।

এখন বুঝি অপারেটর শুনছে না রুকু? টেবিলের ভদ্রলোক বুঝি ফিরে আসেনি? শোনো রুকু, জ্যাঠামশাইয়ের মতো কথা বোলো না। কোথাও বেড়াতে যাওয়া কিংবা এক সঙ্গে দু'-একদিন কাটানো মানেই কি প্রেম?

মানে তো জানি না দয়ী। ঠিক মানে হয়তো তুমি জানো। তবে ওরকমই একটা ভুল অর্থ সকলেই করে নিতে পারে।

তুমিও প্রিমিটিভ রুকু।

আমি কেবল লজিক্যাল হওয়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে লজিক্যাল হতে যাওয়াটা পৃথিবীর পয়লা নম্বরের বোকামি।

তোমার লজিকটা তোমার পার্সোনাল। নিজের ব্যক্তিগত যুক্তি অন্যের ওপর খাটানো কি ঠিক?

বাদ দাও। মাপ চাইছি। এবার যা বলছিলে বলো।

তুমি সিরিয়াস হ'চ্ছো না রুকু। মলয় আমার বন্ধু, তুমি যেমন বন্ধু। তোমাদের কাউকে বিয়ে করার মানে একটা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া। ওরকমভাবে ভাবিনি তো তোমাদের কোনওদিন। মলয় সেটা বুঝতে চাইছে না। কী সুন্দর হুল্লোড়বাজ মজাদার ছেলেটা এখন কেমন প্যাঁচামুখো, গম্ভীর আর আনইন্টারেস্টিং হয়ে গেছে। ইদানীং তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি?

রুকু শান্তস্বরে বলে, গত সপ্তাহে ও আমাকে মোটর-বাইকের পিছনে বসিয়ে ব্যান্ডেল পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল।

কোনও কথা হয়নি আমাকে নিয়ে?

না। ও আমাকে দিল্লি রোডে মোটর-বাইক চালানোর তালিম দিয়েছিল অনেকক্ষণ। আমি কিছুতেই শিখব না, কিন্তু ও শেখাবেই। আমি ওকে বললাম, মোটর-বাইক চালাতে শিখে আমার কোনও লাভ নেই, কেননা কোনওদিনই মোটর-বাইক কেনার মতো পয়সা আমার হবে না। কিন্তু ওকে তো জানো।

জানি বলেই ভাবছি। তোমরা কি ওকে ভয় পাও রুকু?

হয়তো পাই।

কেন, ও কনডেমড খুনি বলে?

আস্তে দয়ী। এসব কথা টেলিফোনে কেন?

আমার কথাটার জবাব দাও।

সম্ভবত সেটাও একটা কারণ।

আমি কিন্তু সেই কারণে চিন্তিত নই। বরং ওটাই আমার কাছে ওর যা কিছু অ্যাট্রাকশন। ও যা করেছে তা পলিটিক্যাল কারণে।

আমাদের অফিসের টেলিফোন অপারেটাররা মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই লাইন কেটে দেয়। আজ দিচ্ছে না কেন জানো?

ইয়ার্কি মেরো না রুকু, কেন?

কাটছে না, কারণ অনেক স্কুপ নিউজ পেয়ে যাচ্ছে।

টেবিলের ভদ্রলোক ফিরে আসেনি তো?

এখনও নয়।

শোনো রুকু, মলয়কে তুমি একটু বোঝাবে?

ও বুঝবে কেন? মলয়কে কোনওদিন কেউ কিছু বোঝাতে পারেনি।

তুমি আমাকে অ্যাভয়েড করছ?

না দয়ী। আমি বাস্তব অসুবিধার কথা বলছি। আমার চেয়ে মলয়ের আই কিউ বেশি, বুদ্ধি বেশি, যুক্তির ধার বেশি, মলয় আমার চেয়ে ঢের বেশি সফল। ওর তিনশো সি সি-র হোন্ডা মোটর-বাইক আছে, আমার যা জন্মেও হবে না। এমনকী ওর যে আর একটা অ্যাডেড অ্যাট্রাকশনের কথা তুমি বলেছিলে তাও আমার নেই। ছেলেবেলায় আমি কৌতূহলবশে একটা কুকুরছানাকে আছাড় দিয়েছিলাম। সেটা মরে যায় তক্ষুনি। সেই অপরাধবোধ আমার আজও আছে।

তুমি সব মানুষকেই একটু বাড়িয়ে দ্যাখো রুকু। ওটা কিন্তু ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেকস। মলয় তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান হলে আমার জন্য পাগল হত না।

পাগল এখনও হয়েছে কি?

আমি ফাইন্যালি রিফিউজ করলে হবে। পুরুষদের আমি চিনি।

রিফিউজ করলে মলয় পাগল হবে এমন নরম ছেলে ও নয় দয়ী। তুমি ভুল ভাবছ।

কিন্তু রিফিউজ করাটাও ভারি অস্বস্তিকর রুকু। এতদিনের বন্ধু, এত মেলামেশা, মুখের ওপর কি বলা যায়? আমি রিফিউজ করলে ওর কিছু করার নেই জানি। কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পারছি না। আমাদের সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্কটা ও এমন কমপ্লেকস করে তুলেছে যে, আমি সব সময়ে নিজেকে নিয়ে লজ্জায় আছি। আমি চাই তুমি মিডিয়েটার হয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দাও। ওকে বোলো আমরা যথেষ্ট অ্যাডাল্ট হয়েছি, ছেলেমানুষী আমাদের মানায় না।

আমাকে ভারী মুশকিলে ফেললে দয়ী। মিডিয়েটার হওয়ার মতো আর কাউকে পেলে না?

তোমার মতো ঠান্ডা মেজাজের লোক আর কেউ নেই। তোমাকে কোনওদিন রাগতে দেখিনি, উত্তেজিত হতে দেখিনি, তুমি কখনও কারও সঙ্গে তর্ক করো না, কাউকে অপমান করো না। তোমার চেয়ে ভাল মিডিয়েটার কোথায় পাবো? মলয়কে যদি কেউ বোঝাতে পারে তবে সে তুমিই।

টেলিফোনে রুকু হঠাৎ চাপা স্বরে বলে, টেবিলের লোকটি এসে গেছে দয়ী। সে আবার আমার বস।

আচ্ছা, ছাড়ছি। কিন্তু একটা কথা বলি, ব্যাপারটা কিন্তু খুব সিরিয়াস! আমি গত তিনদিনে কয়েকবার তোমাকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তোমাদের টু-থ্রি লাইন অফিস টাইমে এত বিজি থাকে যে একদিনও লাইন পাইনি। আজই পেলাম।

আমি বুঝেছি দয়ী। ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস।

ফোন রেখে রুক্মিণীকুমার তার দূরের টেবিলে গিয়ে বসল।

ভাগ্যক্রমে তার টেবিলটা জানালার ধারেই। কাচের বন্ধ শার্শির ওপাশে অবিরল বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। আজ বাড়ি ফিরতে বহুত ঝামেলা হবে। কলকাতার বৃষ্টি মানেই অনিশ্চয়তা, ভয়। তবু রুকু

আজ অনেকক্ষণ বৃষ্টি দেখল। দেখতে দেখতেই ক্যানটিন থেকে দিয়ে-যাওয়া পনেরো পয়সার চা খেল দু'বার, কলিগদের সঙ্গে খুব ভাসাভাসা অন্যমনস্ক আড্ডা দিল। বৃষ্টি দেখে সবাই পালাচ্ছে সুটসাট করে। রুকু বসে রইল। অফিসের কাজ শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বাইরে মরা আলোর দিন, ভেজা, স্যাঁতানো এক শহর। বাইরে যেতে ইচ্ছে করল না।

রুক্মিণী অনেকক্ষণ মলয় আর দয়াময়ীর কথা ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু মনটা বার বার অন্য সব দিকে ঘুরে যাচ্ছে। দয়াময়ীর তো আসলে কোনও সমস্যা নেই। তার গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, বাপের মস্ত কারবার। তার সব সমস্যাই তাই ভাবের ঘরে। তাকে নিয়ে ভাববে কেন রুকু? তবে মলয়ের কাছে একবার সে যাবে। বলবে, তুই না ছিলি পুরো নকশাল! কত লাশ ফেলেছিস! সেই তুই প্রেমের বাজারে হোঁচট খেলে সেটা বড় আফসোস কি বাত।

কতকাল কারও প্রেমে পড়েনি রুকু! সময় পেল কোথায়? হায়ার সেকেন্ডারির পর থেকেই টুইশানি করে পড়তে হত। এখনও অফিসের পর তাকে বাঁধা কোচিং-এ যেতে হয় সপ্তাহে তিনদিন। বড়বাজারে এক চেনা লোকের কাছ থেকে সস্তায় টেরিলিন-টেরিকটন কিনে দোকানে দোকানে বেচে বেড়ানোর একটা পুরোনো ব্যাবসাও আছে তার। সেটা এখন ছোট ভাই দেখছে। আছে জীবনবীমা আর পিয়ারলেসের এজেনসি। আগ্রাসী অভাব রয়েছে রুকুর। তারা তিন ভাই প্রাণপাত করে সংসারটা সামাল দিচ্ছিল। মেজোভাই মাত্র বাইশ বছর বয়সে পাড়ার একটা মেয়েকে হুট করে বিয়ে করে সরে পড়ল। এখন সে আর কুড়ি বছর বয়সের ছোটভাই সংসার চালায়। চার-চারটে আইবুড়ো বোনের কথা ভাবলে রুকু বরাদ্দের বেশি এক কাপও চা খেতে ভরসা পায় না। বাবা বাংলাদেশ থেকে টাকা পাঠাতে পারে না, কিন্তু জমি আঁকড়ে পড়ে আছে।

তবু এইসব রুকুকে বেশি স্পর্শ করে না। জন্মাবধি সে অভাবে মানুষ। ভাগ্যক্রমে তার পরীক্ষার ফল বরাবরই ভাল হত। যে কো-এডুকেশন কলেজে সে পড়ত সেখানে সে একগাদা বড়লোক বন্ধু আর বান্ধবী পেয়ে যায়। মলয় আর দয়ীও তাদের মধ্যে। কিন্তু মনে মনে রুকু জানে ওরা বন্ধু হলেও এক গোত্রের মানুষ নয়।

ভাগ্যই রুকুকে দেখেছে। এই বেসরকারি অফিসে হাজার খানেক টাকা মাইনের চাকরিটাও ভাগ্যই। তবু রুকু কখনও নিশ্চিত বোধ করে না, স্বস্তি পায় না। সে কোনও আশার কথা ভাবে না, স্বপ্ন দেখে না। সে কোনও মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা হওয়ার কথা ভাবতে ভয় পায়।

তবু প্রেম নিয়ে অনেক ভেবেছে সে। ভাবতে ভাবতে আজকাল পুরো ব্যাপারটাই ভারী কাল্পনিক বলে মনে হয়। আগের দিনে মানুষের মন এক জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকতে ভালবাসত। মন বন্ধক দেওয়ার সেই ভাবের ঘরে চুরিকেই মানুষ প্রেম বলে সিলমোহর মেরে দিয়েছিল।

তখনও পাকিস্তান থেকে মা বা ভাইবোনেরা কেউ আসেনি, কুচবিহারে মেজো মাসির বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করত রুকু। সেই সময়ে একদিন বৈরাগী দিঘিতে স্নান করতে যাওয়ার সময় লাটিমদের বাড়ি থেকে ওদের বুড়ি ঠাকুমা ডাক দিয়ে বলল, ও ভাই রুক্মিণী, আমার দেয়ালে একটা পেরেক পুঁতে দিয়ে যা। বৈশাখ মাসই হবে সেটা। নতুন একটা বাংলা ক্যালেন্ডার টাঙাতে গিয়ে বুড়ো মানুষ নাজেহাল হচ্ছে। ক্যালেন্ডারের পেরেক পুঁততে গিয়ে রুকুও নাজেহাল হল কম নয়। তবলা ঠোকার ছোটো হাতুড়ি দিয়ে গজালের মতো বড় পেরেক গাঁথা কি সহজ কাজ! হাতুড়ি পিছলে গিয়ে আঙুল থেঁতলে দেয় বার বার। যা হোক, সেটা তো ঘটনা নয়। ঘটনা ঘটল পেরেক পোঁতার ব্যাপারটা জমে ওঠার পর। লাটিমের ছোড়দি তাপসী ঘরে আসার পর। বয়সে তাপসী হয়তো রুকুর চেয়ে বড়ই ছিল, না হলে সমান সমান! মুখশ্রী বা ফিগার কি খুব সুন্দর ছিল তাপসীর? তা রুকু আজ বলতে পারবে না। কিন্তু সেই প্রথম একটা মেয়েকে দেখে তার মনে হল একটা ঢেউ এসে যেন টলিয়ে দিল তাকে। সে ঢেউ সব কার্যকারণকে লুপ্ত করে দেয়, এক অবুঝ আবেগে মানুষকে অন্ধ ও বধির করে তোলে, বাচাল বা বোবা করে দেয়। হয়তো সেটাই প্রেম। অর্থাৎ

যুক্তিশীল নির্বুদ্ধিতা। তাপসী বলল, এঃ মা, আমার হাতুড়িটা বুঝি গেল শেষ হয়ে। লাজুক রুকু বলল, হাতুড়ির কিছু হয়নি।

মেয়েটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে তার পেরেক ঠোকা দেখল। আর তখন আরও বেশিবার আঙুল থেতলে যেতে লাগল রুকুর।

তাপসী হাসছিল মাঝে মাঝে। বলল, আমাদের বাড়িতে আর বড় হাতুড়ি নেই।

এতেই হবে।— বলল রুকু।

হচ্ছে কোথায়? পেরেকের মাথায় লাগছেই না।

একটু সময় নেবে।

তুমি বুঝি স্নানে যাচ্ছিলে? দেরি হয়ে যাবে না?

আজ ছুটির দিন। দেরি হলে কিছু হবে না।

দেশের বাড়িতে তোমার কে কে আছে?

মা বাবা ভাই বোন।

বোন ক'জন?

চারজন।

সবাই তোমার ছোট? আর ভাই?

সবাই ছোট।

তোমার বয়স কত?

সতেরো হবে বোধহয়।

বোধহয় কেন? ঠিক জানো না?

আমি হিসেব রাখি না।

বাড়ির জন্য মন খারাপ লাগে না?

আগে লাগত। এখন সয়ে গেছে।

মাসি খুব ভালবাসে বুঝি?

বাসে।

তোমার ডাকনাম তো রুকু, ভাল নাম কী?

রুক্মিণীকুমার।

বেশ নাম তো। এরকম নাম আজকাল শোনা যায় না। বলো তো বঙ্কিমের কোন উপন্যাসে এই নাম আছে?

রাধারানী।

ও বাবা, তুমি তো অনেক পড়েছ! মোটেই গাঁইয়া নও।

পাকিস্তানেও আমরা শহরেই থাকি। গাঁয়ে নয়।

কোন শহর?

ময়মনসিং।

কুচবিহারের মতো এমন ভাল শহর?

এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না, তবে এর চেয়ে অনেক বড়।

আমাদের কুচবিহারের মতো এত ভাল শহর কোথাও নেই, তা জানো? এত নিট অ্যান্ড ক্লিন শহর দেখেছ কখনও?

এইরকম সব কথা হয়েছিল সেদিন। অনেক কথা। খুব কথা বলতে ভালবাসত তাপসী। খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে। একই ক্লাসে পড়ত তারা। রুকু জেংকিন্স স্কুলে, তাপসী সুনীতি অ্যাকাডেমিতে। স্কুলের সেটা শেষ বছর। তখন উপর্যুপরি ঢেউ আসত। ঢেউয়ে টালমাটাল হয়ে

যেত রুকু। একা শুয়ে যখন ভাবত তখন টের পেত তার বুকের মধ্যে কাঁকড়া হেঁটে বেড়াচ্ছে। তেমনি তীক্ষ্ণ অনুভূতি, জ্বালা। মাঝে মাঝে ধক করে ওঠে বুক আনন্দে। এক-একদিন হোঃ হোঃ খুশির হররায় পাগল হয়ে যায় মাথা।

খুব বেশিদিন নয়। পরিচয় হওয়ার মাত্র দু'মাসের মাথায় একটা ভুখা মিছিল বেরোল শহরে। স্কুল-কলেজে ধর্মঘট। রাজনীতির নেতারা বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ফ্ল্যাগ-হাতে এগিয়ে দিয়েছিলেন সেই মিছিলে। সাগরদিঘির সামনে পুলিশের ব্যারিকেড। মিছিল থামবে কি এগোবে তা কেউ বলে দেয়নি। সুতরাং মিছিল ধীরে ধীরে এগোল। কী কারণে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল তা কোনওদিনই জানতে পারেনি কেউ সঠিকভাবে। সেই মিছিল এগিয়ে গেলেই বা সরকারের কী ক্ষতি হত? সাগরদিঘির শান্ত, নিরালা রাস্তার ওপর মোট চারজন গুলি খেয়ে মরে গেল। আর কী আশ্চর্য! সেই চারজনের মধ্যে একজন তাপসী।

খবর পেয়ে শহর ভেঙে পড়েছিল সেখানে। পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিল রুকুও। দেখল, তাপসীর নতুন যৌবনে ফুটে ওঠা একটি স্তন বিদীর্ণ করে পাঁজর ফাটিয়ে গুলি বেরিয়ে গেছে। একটা গুলিতে অত বড় ক্ষত হতে পারে তা জানা ছিল না রুকুর। ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে।

তাপসী কোনওদিন রাজনীতি করেনি, মিছিল-টিছিলেও যায়নি। সেবার জোর করে স্কুল থেকে কয়েকজন বড় মেয়ে তাদের কয়েক জনকে ধরে নিয়ে যায়।

কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। তাপসী মরে যাওয়ার পর রুকুর কয়েকদিন কাটল মানসিক অন্ধকারে। ভিতরে একটা দিশেহারা নিরালম্ব ভাব। সেটা কি গভীর শোক? নাকি সেই গুলির ক্ষত দেখে বিস্ময়মিশ্রিত ভয়? আজও ভাবলে হাসি পায়, তাপসীর মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন সে সন্ধের পর একা থাকতে ভয় পেত। মনে হত, তাপসীর ভূত এসে দেখা দেবে। তবে কী করে সে বলবে যে তাপসীর প্রতি তার ভালবাসা ছিল?

মৃত্যুর বেশ কিছুদিন বাদে তাপসীর মা এসে একদিন মাসির কাছে বলেছিল, আর তো কিছু মনে হয় না, শুধু ভাবি মেয়েটা মরার সময়ে কত না জানি ব্যথা পাচ্ছিল, হয়তো মা বলে ডেকেছিল কতবার। ওই শেষ সময়টায় ওর কাছে তো কেউ ছিল না, কে জানে তখন তেষ্টা পেয়েছিল কি না, খিদে পেয়েছিল কি না!

শুনে ভারী ছিছিক্কার বেজেছিল রুকুর মনে। কই, সে তো কখনও মায়ের মতো তাপসীর মৃত্যুযন্ত্রণার কথা ভাবেনি! ভাবেনি তো, শেষ সময়ে ওর জলতেষ্টা পেয়েছিল কি না! পিচের রাস্তায় এক ভিড় লোকের মধ্যে, জলজ্যান্ত দিনের আলোয় নিজের রক্তে মেখে এক বুক ক্ষতের যন্ত্রণায় হাঁফাতে হাঁফাতে মৃত্যুর মধ্যে একা ডুবে যেতে কেমন লেগেছিল তাপসীর, তা কখনও অনুভব করার চেষ্টাও করেনি রুকু। না করলে ভালবাসা কী করে হল?

বার বার ঘটনাটা ভাঁজে ভাঁজে খুলে ভেবে দেখেছে রুকু। আজও সন্দেহ রয়ে গেছে, তাপসীকে সে ভালবেসেছিল কি না। মন বলে, বেসেছিল। যুক্তি বলে, না। তাপসী যদি আজও বেঁচে থাকত তবে কী হত? নিশ্চিত বলা যায়, রুকুর সঙ্গে তার বিয়ে হত না।

কারণ রুকুর বিয়ের বয়স হওয়ার আগেই তাপসীর বিয়ের বয়স হয়ে যেত। তাছাড়া, সমানবয়সি মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে বাধা আসত। কে জানে হয়তো তাপসীই রাজি হত না। আর যদি অঘটনক্রমে বিয়ে হতই তবে তাপসীকে আজ কেমন লাগত রুকুর? হয়তো ভাল নয়, হয়তো একঘেয়ে, হয়তো মনকষাকষি। এসবই তো হয়। রুকু জানে।

জুডিসিয়াল এনকোয়ারি বসল ল্যান্সডাউন হলে। রোজই সেই শুনানিতে যেত রুকু। বার বার তাপসীর নাম উঠত। রুকুর অল্পবয়সি মন চাইত, কঠোর প্রতিশোধ। কিন্তু সেই তদন্তে কিছুই হল না, কেউ শাস্তি পেল না। পুলিশের বড় অফিসারকে শুধু বদলি করে দেওয়া হল।

রুকুর জীবনে প্রেম বলতে এটুকুই। এটুকুই সে বহুবার ভেবেছে, বিশ্লেষণ করেছে গবেষণা

করেছে। রুকুর স্মৃতিশক্তি প্রখর বলে কোনও খুঁটিনাটিই সে ভুলে যায় না। আজও তাপসীর সেই সতেরো বছরের চেহারাটা মনে আছে হুবহু। যত কথা হয়েছে তার সঙ্গে সবই প্রায় আজও মুখস্থ আছে রুকুর। আরও দিন গেলে পাছে ভুলে যায় সেই ভয়ে লিখেও রেখেছে একটা পুরনো ডায়েরিতে। মাঝে মাঝে বের করে পড়ে।

বাইরে এখনও অঝোর বৃষ্টি। আবছা হয়ে এল কলকাতা। কিন্তু আর বসে থাকার মানে হয় না। রুকু উঠল।

॥ দয়ী ॥

আর পাঁচজনের যেমন শান্তশিষ্ট নিরীহ ভদ্রলোক বাবা থাকে, দয়াময়ীর সেরকম নয়। তার বাবা বসন্ত দস্তিদার একসময়ে বাগমারির একচ্ছত্র গুন্ডা ছিল। আজও অনেকে বসন্তবাবুকে বে-খেয়ালে বসনগুন্ডা বলে ফেলে। কিংবা ট্যারা বসন। আটষট্টি-উনসত্তর সাল পর্যন্ত বাগমারি শাসন করেছিল বসন্ত দস্তিদার। তারপর হঠাৎ তার দল ভেঙে সফি আর কালো নামে দুই ভাই আলাদা হয়ে দল করল। দিনরাত দুই পক্ষে বোমবাজি আর লাঠি ছোরা চলত। বসন্ত দস্তিদার টের পেল, শুধু কালো আর সফিই না, নতুন গোঁফ-ওঠা একদল স্কুল-কলেজের ছোকরাও খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। পুলিশের খাতায় তাদের নাম নেই, কেউ চুরি-ছিনতাই, ওয়াগন ভাঙার মামলাতেও থাকে না। এরা শুধু শ্রেণিশত্রু খতম করতে চায় এবং তাদের লিস্টে বসন্তেরও নাম আছে।

বসন্তের তখন বয়স হয়েছে, টাকাও হয়েছে। ঝুট-ঝামেলায় না থেকে সে টালিগঞ্জের গলফ ক্লাবে একটা পুরনো বাড়ি কিনে উঠে এল। ভোল পালটে গেল।

বাবার এই পুরো ইতিহাসটাই জানে দয়াময়ী। তার বাবা আজও নিছক ভদ্রলোক নয়। এক সময়ে অসাধারণ সুপুরুষ ছিল, লম্বা জোরালো ফরসা চেহারা। এখন চেহারায় কিছু মেদসঞ্চার হলেও বসন্ত ইচ্ছে করলে চার-পাঁচ জোয়ানের মোকাবিলা করতে পারে। এখনও সঙ্গে রিভলবার থাকে বাবার। মুখ দিয়ে অনর্গল খিস্তি বেরোয়। রেগে গেলে এখনও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। নিজে গুন্ডামি না করলেও এই অঞ্চলেও তার একটা দল তৈরি হয়েছে। তাদের দাপট কম নয়। বসন্তের সঙ্গে পুলিশ-দারোগা, এম-এল-এ, মিনিস্টারদের বেশ খাতির। পাঁচ-সাতখানা ট্যাক্সি, দুটো মিনিবাস আর গোটা দশেক লরি আছে তার। এখন টাকা রোজগার করাই তার একমাত্র নেশা।

দয়াময়ীরা তিন বোন, দুই ভাই। তিন বোন বড়, ভাইয়েরা ছোট। বোনদের মধ্যে দয়াময়ী মেজো। বড় মৃন্ময়ী সেই বাগমারিতে থাকতে বয়োধর্মে বাবার দলের এক ছোকরা মস্তানের সঙ্গে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। সাতদিন নিরুদ্দেশ থাকার পর পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্তে তারা ধরা পড়ে, বিনা পাশপোর্টে যশোরে যাওয়ার চেষ্টা করায়। তারা জানত এ দেশে থাকলে বসন্ত গুন্ডার হাত থেকে রেহাই নেই। রেহাই পায়ওনি শেষ পর্যন্ত। বসন্তই সীমান্ত পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়েছিল দু'জনকে। তার কয়েকদিন বাদেই উলটোডিঙির রেললাইনে সেই ছোকরা প্রেমিকের কাটা মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃন্ময়ীর অতীত ইতিহাস চেপে রেখে পরে তার বিয়ে দেওয়া হয় এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। কিন্তু তার শ্বশুরবাড়িতে সবই জানাজানি হয়ে যায়। তারা মৃন্ময়ীর ওপর বাইরে থেকে কোনও নির্যাতন করেনি ঠিকই, কিন্তু স্বামী তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না।

দয়াময়ী জানে, বাবা এখন আর আগের মতো নেই। এখন দয়াময়ী কাউকে বিয়ে করতে চাইলে বাবা আপত্তি করবে না। এখন বসন্ত ছেলেমেয়েদের কোনও ব্যাপারেই বাধা দেয় না। দয়াময়ীরা খুবই স্বাধীন এবং খানিকটা স্বেচ্ছাচারীও। মৃন্ময়ী ছাড়া তারা আর সব ভাইবোনই পড়াশুনো করেছে

ইংরিজি মিডিয়ামের স্কুলে, ভাল কলেজে। তারা চৌকস, চালাক, স্বার্থসচেতন। মৃন্ময়ীর মতো ভুল তারা করবে না।

সেই মৃন্ময়ী এখন দাঁড়িয়ে আছে সাততলার ফ্ল্যাটের উত্তর দিকের ব্যালকনিতে। সদর দরজা খোলা। বাচ্চা চাকরটা স্কুল-ফেরত বাবুনকে খেতে দিচ্ছে ডাইনিং টেবিলে। দয়ী ঘরে ঢুকে দৃশ্যটা দেখল। একটা সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাটের মধ্যে নিজেকে কী করে আঁটিয়ে নেয় মানুষ কে জানে! দয়ী কোনওদিন কারও ঘরকন্না করতে পারবে বলে মনে হয় না।

বাবুন মুখ তুলে হাসল, হাই দয়ী আন্টি।

দয়ী চোখ টিপে বলে, হাই।

মৃন্ময়ীর এলোচুলে শুকনো ঝোড়ো বাতাস লাগছে। ভারী আনমনে তাকিয়ে আছে বাইরে। দয়ী নিঃশব্দে গিয়ে পাশে দাঁড়াল। বলল, কী গরম আজ!

মৃন্ময়ী মুখ ফিরিয়ে হাসল, এই এলি? কখন থেকে তোর জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

সাততলায় বড্ড বাতাস। দয়ীর গলা আর বুকের ঘামে বাতাস লাগতেই শিরশির করে উঠল গা। বলল, বিশুকে ফ্রিজ থেকে জল দিতে বল তো।

ঠান্ডা খাস না। আমি মিশিয়ে দিচ্ছি।

মৃন্ময়ী চলে গেল।

একবার দিদির দিকে ফিরে তাকায় দয়াময়ী। সবই স্বাভাবিক মৃন্ময়ীর। কেউ দেখে বুঝতে পারবে না যে, ওর জীবনে কোনও সুখ নেই।

কিংবা সুখের ধারণা হয়তো দয়াময়ীর ভিন্ন রকমের। কার মনে সুখ আছে, কার মনে দুঃখ, তা কে জানে বাবা! তবে মৃন্ময়ী সুখে নেই মনে করে যাওয়া-আসার পথে মাঝে মাঝে চলে আসে দয়াময়ী। এসে দেখতে পায় এই ফ্ল্যাটের ছিমছাম সংসারে অবধারিত এক জেনারেশন গ্যাপ। তার সঙ্গে মৃন্ময়ীর। মৃন্ময়ীর সঙ্গে তার ছেলে বাবুনের। মৃন্ময়ীর কোনও বোধ, ধারণা, বিশ্বাস বা জ্ঞানগম্যির সঙ্গেই মেলে না দয়াময়ীর। তবু তাদের ভাইবোনদের মধ্যে যদি কারও সঙ্গে কিছু ভালবাসা থেকে থাকে দয়ীর তবে তা আছে এই দিদির সঙ্গেই। মৃন্ময়ী তার চেয়ে বছর পাঁচেক বা তারও বেশি বড়। মাঝখানে আরও দুটো বোন হয়েছিল, বাঁচেনি।

মৃন্ময়ী ঠান্ডা আর সাদা জল খুব নিপুণভাবে মিশিয়ে এনেছে। কষে একটা পোকা দাঁত আছে দয়ীর। খুব ঠান্ডা খেলে চিনচিন ব্যথা করে। এখন সেই ব্যথাটা তেমন হল না। গলা বুক ঠান্ডায় জ্বলে গেল না। অথচ ঠান্ডা হল। খুব ছোট ছোট চুমুকে জলটা খেতে খেতে দয়ী বলে, তুই কী করে যে পারিস!

কী পারি?

বড্ড বাতাস। এত বাতাসে চেঁচিয়ে না বললে কিছু শোনা যায় না। কিন্তু দয়াময়ীর চেঁচাতে ইচ্ছে হল না বলে জবাব দিল না। অদূরের গড়িয়াহাটার দিকে চেয়ে রইল।

মৃন্ময়ী রেলিং দিয়ে ঝুঁকে নীচের রাস্তার দিকে চেয়ে দেখে বলে, কতক্ষণ ধরে তোর গাড়িটা দেখতে পাব বলে দাঁড়িয়ে আছি। কই, দেখতে পেলাম না তো! আজ গাড়ি আনিসনি?

দয়াময়ী তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল, ওই তো নীল ফিয়াটটা।

রং করালি বুঝি? আগে তো সবুজ ছিল।

দয়াময়ীর মনটা করুণ হয়ে যায়। মৃন্ময়ী যখন যুবতী তখন বসন গুন্ডার টাকা হয়নি এত। মৃন্ময়ী তাই নিজের গাড়ি চালিয়ে দাবড়ে বেড়ানোর আনন্দ ভোগ করেনি কখনও। যার সঙ্গে বিয়ে হল তার টাকা আছে বটে, ভালবাসা নেই। তবু মৃন্ময়ী কখনও ভাইবোনকে হিংসে করে না; বরং তারা গাড়ি চালায়, বড়লোকের মতো থাকে আর স্বাধীনতা ভোগ করে বলে মৃন্ময়ীর একটু গৌরববোধ আছে।

দয়ী কথার জবাব না দিয়ে বলল, তোর অতিথি কখন আসবে?

বিকেলে।

মুরগি আনিয়ে রেখেছিস?

মাথা নেড়ে মৃন্ময়ী বলে, তোর জামাইবাবু কাল নিউ মার্কেট থেকে এনে রেখেছে। জ্যান্ত। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমি জ্যান্ত পাখি কাটতে পারি না, বড্ড মায়া হয়। বিশু বলছে সেও পারবে না। তুই কি পারবি?

ভ্রু কুঁচকে দয়ী বলে, পারব না কেন? আমার অত মায়াদয়া নেই। খেতে যখন পারব তখন কাটবার বেলায় কেন ঘোমটা টানা বাবা, চল দেখি কেমন মুরগি।

মৃন্ময়ীর পিছু পিছু রান্নাঘরে আসে দয়াময়ী। ধামাটা খুব সাবধানে ফাঁক করে উঁকি মেরে দ্যাখে। অন্তত গোটা পাঁচেক মুরগিছানা কুক কুক করে ওঠে মুক্তির অপেক্ষায়।

দয়াময়ী ধামা ফেলে ওপরে ভারী নোড়া ফের চাপা দিয়ে বলে, এ বেলা কী রেঁধেছিস বল তো! বড্ড খিদে পেয়েছে।

কেউ খেতে চাইলে মৃন্ময়ী খুশি হয়। উজ্জ্বল মুখে বলে, চল খাবি। ভাল চিংড়ি আছে। গলদা।

বাবুন ডাইনিং টেবিলে নেই। উঠে গিয়ে পড়ার টেবিলে বসেছে উইকলি টেস্টের জন্য তৈরি হতে। দয়ীকে ভাত বেড়ে দিতে দিতে মৃন্ময়ী বলে, বাবুনের যে কত পড়া! ছেলেটা নাওয়া-খাওয়ার সময় পায় না। আমি বলি একটু বিশ্রাম কর। তা শোনে না।

দয়ী তাকাল। মা ছেলের সম্পর্কটা জানে সে। এ বাড়িতে মৃন্ময়ীর কোনও মতামত নেই, কোনও কর্তৃত্ব নেই। বাবুন কখনও মৃন্ময়ীকে পাত্তা দেয় না।

মৃন্ময়ী একটা শ্বাস ফেলে বলে, বাবুন সেই বাবা-ভক্তই হল। আগে ভাবতাম, অন্তত বাবুনটা আমার দিক নেবে। কিন্তু এখন কেমন একটা নতুন হাওয়া এসেছে। বেশির ভাগ বাচ্চা-কাচ্চাই এখন মায়ের চেয়ে বাপের বেশি ভক্ত।

এসব তত্ত্ব জানার ইচ্ছে দয়ীর নেই। তাদের বাড়িতে কেউই তেমন বাপ-ভক্ত নয়। একটু ঠাট্টা করার জন্যই দয়াময়ী হঠাৎ বলল, তুইও কি তাই?

আচমকা মৃন্ময়ীর মুখ থেকে রক্তের রং সরে গেল। কিছুটা স্থির হয়ে গেল সে। কোনও জবাব দিল না।

দয়ী চোখ সরিয়ে নেয়। এই একটা প্রসঙ্গেই মৃন্ময়ীর যত অস্বাভাবিকতা। আজও বাবার সামনে গেলে বা বাবার প্রসঙ্গ উঠলেও মৃন্ময়ী কেমন একরকম হয়ে যায়। মৃন্ময়ীকে যদি কেউ কখনও বলে, তোমার বাবা তোমাকে এই সাততলার বারান্দা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়তে বলেছে, মৃন্ময়ী ঠিক এমনি সাদা মুখে, শুকনো চোখে একবার চারদিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখবে, তারপর নিয়তির নির্দেশে চালিত হওয়ার মতো গিয়ে ঠিক লাফিয়ে পড়বে।

দয়াময়ী গম্ভীর হয়ে গেল। বিরক্তির সঙ্গে বলল, বাবাকে তোর এত ভয় কেন বল তো! আমরা তো কেউ ভয় পাই না। ইন ফ্যাক্ট বাবাই আমাদের সমীহ করে চলে।

মৃন্ময়ী জবাব না দিয়ে উঠে গেল। রান্নাঘরে খানিকটা সময় কাটিয়ে ফিরে এসে বসল চোরের মতো। খুব চাপা স্বরে ফিসফিস করার মতো বলল, আমি সবাইকে ভয় পাই। তোর জামাইবাবুকে, বাবুনকে, বাবাকেও।

দয়ী দিদির দিকে চেয়ে দেখল। মনটা রাগ আর বিরক্তিতে ভরা। এই মেয়েটার ওপর সবাই এত নির্যাতন করে কেন? বয়সের দোষে বোকা মৃন্ময়ী যখন ছোকরা গুন্ডাটার সঙ্গে পালিয়েছিল তখন থেকেই তার লাগাতার নির্যাতনের শুরু। পালিয়ে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে তারা ভয়ংকর বসন গুন্ডার হাতে ধরা পড়ার ভয়ে ছায়া দেখেও চমকে উঠত। মরিয়া হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানে। মাফিয়াদের মতোই অমোঘ ট্যারা বসনের দল সেইখানে সীমান্ত পুলিশের হেফাজতে যখন তাদের নাগাল পেল তখনই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল মৃন্ময়ী। পরে রেল লাইনের ধারে তার

প্রেমিকের কাটা-ছেঁড়া মৃতদেহ তাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল ট্যারা বসন। বলেছিল, দেখে রাখ। ভবিষ্যতে মনে রাখিস। সেই লজ্জা আর ভয় ভুলবার আগেই এক চকচকে ভদ্রঘরে বিয়ে হয়ে গেল মৃন্ময়ীর। যখন পেটে বাবুন এল তখনই একদিন তার স্বামী সরিৎ তার অতীতের সেই লজ্জার কথা জানতে পারে। বসন্ত দস্তিদারের শত্রুর অভাব নেই, তাদেরই কেউ জানিয়েছিল। মৃন্ময়ী ভয়ে লজ্জায় আর-একদফা স্তম্ভিত হয়ে গেল। যেন কেউ তাকে সম্পূর্ণ ন্যাংটো করে ফ্লাড লাইটের সামনে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিছুই গোপন নেই। লজ্জার সেটাই শেষ নয়। সরিৎ রাগে দুঃখে তার সব বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, আত্মীয়দের কাছে বলে দিয়েছিল সেইসব কথা। তারপরও মৃন্ময়ী যে পাগল হয়ে যায়নি সেইটেই যথেষ্ট। আজও মৃন্ময়ী এক অস্বাভাবিক অবস্থায় বড় অনাদরের জীবন যাপন করে যাচ্ছে। অবিরল নিরাবরণ অবস্থায় পাদপ্রদীপের আলোয় দর্শকদের সামনে সে দাঁড়িয়ে। আজ আর লজ্জা নেই, তবে এক হীনমন্যতায় ডুবে সে নিজের সব বোধ হারিয়ে ফেলেছে ক্রমে। বয়ঃসন্ধির সেই বোবা ভয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা, বাবার ভয়ংকর চেহারা আজও তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাকে নিরন্তর লজ্জা ও অনাদরের যন্ত্রণা দেয় তার স্বামী আর ছেলে।

মৃন্ময়ীকে এই গহ্বর থেকে কোনওদিনই বোধহয় আর টেনে তোলা যাবে না।

সেই ঘটনাটার কথা সঙ্কোচবশে কখনও দিদিকে জিজ্ঞেস করেনি দয়ী। তখন দয়ী খুব ছোট। দিদিকে ফিরিয়ে আনা হল বাড়িতে। দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় একটা তালাদেওয়া ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকত সারা দিন। কাঁদত না, গোঙানোর মতো একরকম বোবা শব্দ করত। সারা গায়ে মারের দাগ। চুল ছেঁড়া, ঠোঁট রক্তাক্ত। বিভীষিকার মতো দিন গেছে সেসব।

আজ দয়ী কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। বলল, দিদি, একটা কথা বলবি? লাটুকে তুই কেমন বাসতিস?

লাটু! লাটুটা আবার কে?— মৃন্ময়ী ভারী অবাক হয়।

সেই যে। যার সঙ্গে তুই চলে গিয়েছিলি!

মৃন্ময়ীর বিস্মিত মুখ হঠাৎ-স্মৃতিতে সিঁদুরে হয়ে গেল। দিশেহারার মতো চারদিকে একবার তাকাল, বোকার মতো হাসল, শ্বাস ফেলল। তারপর মাথা নিচু করে বলল, খুব তেজি ছিল। বেঁচে থাকলে বাবাকে হয়তো ও-ই জব্দ করত একদিন।

খুব তেজি?

সাংঘাতিক। বিশ বছরও বয়স হবে না, তার মধ্যেই পাঁচ-ছ'টা খুন করেছিল।

তোর খুনিকে পছন্দ হল কেন?

ওই বয়সটাই ওরকম। মনে করতাম, খুনটা খুব বাহাদুরির কাজ।

তাকে খুব ভালবাসতিস?

আমি?

বলে চমকে ওঠে মৃন্ময়ী। ভয় পেয়ে মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি বলে, আমি নয়। ওই তো আমাকে সব বলত। বিয়ে করি চলো, বসনদাকে বলি চলো।

তুই কিছু বলিসনি?

আমি বারণ করতাম। জানি তো, শুনতে পেলে বাবা মেরে ফেলবে।

তারপর?

কিন্তু ও খুব তেজি ছিল। ভীষণ সাহস। বলত, বসনদা রাজি না-হলেও কুছ পরোয়া নেই। চলো, ভাগব। সেই সাহস দেখেই আমি কেমন যেন সাহসী হয়েছিলাম। পালিয়ে গিয়ে কিন্তু বুঝেছিলাম, বাবার হাত থেকে বাঁচব না। সব জায়গায় বাবার লোক। ও আমাকে কালীঘাটে নিয়ে যায় বিয়ে করবে বলে। বাবা তো ভীষণ বুদ্ধিমান। বাবা ঠিক জানত আমরা কালীঘাটে যাব। সেখানে নারায়ণ

নামে বাবার একজন লোক আমাদের ধরে। ট্যাক্সি করে যখন আমাদের বাগমারি নিয়ে যাচ্ছিল তখন মানিকতলা ব্রিজ পেরিয়ে নির্জন একটা রাস্তায় লাটু নারায়ণদাকে মারল। ট্যাক্সির মধ্যে। অনেকক্ষণ ধরে তক্কে তক্কে ছিল। কিন্তু নারায়ণদাও তো কম নয়। সেই সময়টা সামনে ঝুঁকে ট্যাক্সির ড্রাইভারকে রাস্তা চেনাচ্ছিল, লাটু আচমকা পিঠে ছোরা ঢুকিয়ে দিল। আমার কোল ভরে গেল রক্তে। দু'হাতে রক্ত। কী গরম! লাটু একটুও ঘাবড়ায়নি। নারায়ণদার লাশ রাস্তায় ফেলে দিয়ে সেই ট্যাক্সি করেই আমরা পালাই। একটা বস্তিতে দু'দিন, কসবায় এক রাত্রি, এক বন্ধুর বাড়িতে এক রাত্রি কাটে। স্ট্র্যান্ড রোডে মস্ত মস্ত যেসব কংক্রিটের পাইপ আছে, তার মধ্যেও ভিখিরিদের সঙ্গে এক রাত্রি কাটিয়েছি। বাবা তখন তুলকালাম করছে আমাদের খোঁজে। লাটু কখনও ভয় পেত না তাতে। তাই খুব সাহস পেতাম। লাটু যেরকম ছিল সেরকমটা এখন দেখি না।

তার মানে তুই লাটুকে ভালবাসতিস দিদি।

না না!

আর্তস্বরে বলে ওঠে মৃন্ময়ী। তারপরই নিজের গলার স্বরে চমকে ওঠে। চারদিকে চায়।

মৃন্ময়ীর স্বরটা কিছু ওপরে উঠেছিল। কাশ্মীরী কাঠের নকশা করা পারটিশনের ওপাশ থেকে বাবুন মুখ বাড়িয়ে বিরক্ত গলায় বলে, দয়ী আন্টি, হোয়াট ইজ গোয়িং অন? এনিথিং রং?

নাথিং ডার্লিং!— দয়ী বিস্ময়ের ভান করে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলে, জাস্ট টকিং ওভার সাম ফানি থিংস।

মৃন্ময়ী বাবুনের দিকে চেয়ে ছিল। ভয়ে সম্মোহিত তার দৃষ্টি।

বাবুন টেবিল থেকে একটা চিংড়িমাছ তুলে নিয়ে চলে যায়। দয়ী সামান্য খেয়ে উঠে পড়ে। কাজ আছে।

জওহরলাল নেহরু চিকেন রয়্যাল খেতেন। রান্নাটা কলেজের এক বান্ধবীর কছে শিখেছিল দয়ী। মাঝে মাঝে রাঁধে। পরশুদিন মৃন্ময়ী টেলিফোন করেছিল। তার কোনও এক মাসতুতো না পিসতুতো দেওর বারো বছর ফিলাডেলফিয়ায় থেকে সদ্য এসেছে। মাত্র পাঁচ মাসের ছুটি তার। এর মধ্যেই সে পাত্রী দেখে পছন্দ করে বিয়ে সেরে বউ নিয়ে আবার ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে যাবে। আত্মীয়স্বজনরা তাকে নেমন্তন্ন করে আইবুড়ো ভাত খাওয়াচ্ছে খুব।

মৃন্ময়ী ফোনে বলেছিল, তোর সেই চিকেন রয়্যাল ওকে খাওয়াতে চাই।

দয়ী বলল, ওসব করতে যাবি কেন? বিদেশে ওরা ওসব কত খায়। তুই বরং শুক্তো মাছের ঝোল দিয়ে খাওয়া।

মৃন্ময়ী তাতে রাজি নয়। বলল, তা হয় না। তোকে আসতেই হবে। চিকেনও রাঁধতে হবে।

কেন? আমাকে আসতেই হবে কেন?

সব কথার অত খতেন নিস কেন? বলছি আসবি।

মনে মনে হেসেছিল দয়ী। মৃন্ময়ীর দেওরভায়া পাত্রী দেখতে আমেরিকা থেকে এতদূর এসেছে সেটা সে ভুলে যায়নি। তবে দয়ীর একবার পরীক্ষাটা দিতে আপত্তি নেই। যদি লোকটাকে তার পছন্দ হয় এবং তাকেও লোকটার, তবে ফিলাডেলফিয়ায় গিয়ে ঘরসংসার করতে দোষ কী? শুনেছে লোকটা সেখানে বহু টাকা রোজগার করে, একটা বাড়ি আর দু'-দুটে গাড়ি আছে। দোষের মধ্যে বয়সটা ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ। হিসেবে দয়ীর চেয়ে দশ-এগারো বছরের বড়। তা হোক।

খেয়ে উঠে দয়ী আঁচল কোমরে বেঁধে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে মুরগি কাটতে বসল। সঙ্গে বাবুন। বাইরে থেকে মৃন্ময়ী দরজায় টোকা দিয়ে বলে, এগুলোকে বেশি কষ্ট দিস না দয়ী। টপ করে কেটে ফ্যাল।

একটা মস্ত ভোজালি হাতে বাবুন পাশেই দাঁড়িয়ে খুব তড়পাচ্ছিল, আই অলসো ক্যান ডু ইট আন্টি। গিভ মি ওয়ান।

বাবুন ভুল করে ধামা তুলতেই মুরগির ছানাগুলো কুক-কুক করে ডাকতে ডাকতে উল্টোপাল্টা দৌড় লাগাল উর্ধ্বশ্বাসে। কিন্তু বন্ধ ঘর থেকে পালানোর পথ না পেয়ে দেয়ালে দরজার গ্যাস সিলিন্ডারে ধাক্কা খেয়ে ছটফটিয়ে ঘুরছে, একটাকে ধরে ফেলেছিল দয়ী। মস্ত ধারালো বঁটিতে গলাটা চোখের পলকে ছিন্ন করে দিল সে। টিপে ধরে রইল নলি, যাতে খুব বেশি রক্ত না পড়ে। তবু পড়ল। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ছড়িয়ে পড়ল সাদা মেঝেয়।

বাবুনের মুখ সাদা হয়ে গেছে দৃশ্যটা দেখে। তবু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করে বলল, ইউ আর এ ব্র্যান্ডেড কাটথ্রোট দয়ী আন্টি।

রিয়েলি?— বলে দয়ী ভ্রু তুলে হাসে। তারপর বলে, তুই বোকার মতো ধামাটা হড়াস করে তুলে ফেললি কেন রে? আমি হাত ঢুকিয়ে একটা একটা করে ধরে বের করতাম। নাউ হেলপ মি টু ক্যাচ দেম।

ঝটাপটি করে দু'জনে মিলে আরও পাঁচটা মুরগি ধরল। ভীষণ চেঁচাচ্ছিল মুরগিগুলো। চোখের সামনে বন্ধুদের রক্তমাখা লাশ দেখে কিছু বুঝে নিয়েছিল তারা। ছ' নম্বরটায় সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ ছিল। একটা তাকের ওপর উঠে বসেছিল সেটা। বাবুন আলু ছুঁড়ে সেটাকে ওড়াল তো বসল গিয়ে আলোর শেডের ওপর। আলু ছুঁড়তে গিয়ে বালবটা ভাঙল বাবুন। কাচে হাত কাটল দয়ী। ঘেমে চুমে একাকার হল। মুরগিটা কোঁক-কোঁক করে আতঙ্কিত চিৎকারে ঘর ভরে দিল, তারপর প্রাণভয়ে ঘুরতে লাগল চারপাশে।

বাবুন ফ্যাকাসে মুখে বলে, লিভ ইট আন্টি। লেট ইউ গো।

দয়া বলে, লাভ নেই রে বাবুন। আমরা ছেড়ে দিলেও আর কেউ ধরে খাবে। কিপটে বাপের পয়সা নষ্ট করবি কেন? আয় ধরে ফেলি।

ড্যাড ইজ নো মাইজার।— বাবুন বলে।

হি ইজ।

বলে একটা জলচৌকির ওপর উঠে খুব সাবধানে কাপপ্লেটের র‍্যাকের ওপর বসে থাকা মুরগিটার দিকে হাত বাড়ায় দয়ী।

পিছন থেকে বাবুন মৃদু স্বরে বলে, ইউ হ্যাভ এ নাইস ফিগার আন্টি। থার্টি সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি সিক্স।

হাসতে গিয়ে মুরগিটা উড়ে পালাল। দয়ী বলে, খুব পাকা হয়েছিস বাবুন। স্কুলে এসব শেখাচ্ছে বুঝি!

সিওর। উই ইভন ডেট দি গার্লস।

মাই গড!

মুরগিটা গ্যাস সিলিন্ডারের পিছনে লুকোতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়ল। নড়তে পারল না। দয়ী হাত বাড়িয়ে ঠ্যাং ধরে টেনে আনল সেটাকে। বলল, আমরা যখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তাম তখন এত পাকা ছিলাম না।

আই নো ইউ হ্যাড এ বানচ অফ লাভারস।

মারব থাপ্পড়।— বলে হাসিমুখেই দয়ী মুরগিটার গলা নামিয়ে দিল।

কাট থ্রোট।— বাবুন বলে।

দরজায় টোকা দিয়ে মৃন্ময়ী সভয়ে বলে, কী করছিস তোরা ভিতরে? কী ভাঙলি ও বাবুন? মুরগিগুলো অমন চেঁচাচ্ছিল কেন রে? আমি বাথরুমে পর্যন্ত থাকতে পারছিলাম না চেঁচানিতে।

বাবুন মৃদুস্বরে বলে, শি ইজ এ মেন্টাল কেস।

দয়ী বলে, ওরকম বলতে নেই বাবুন।

শি হ্যাড অলসো এ লাভার ইউ নো। এ ব্যাড গাই।

দয়ী স্তম্ভিত হয়ে যায়। জামাইবাবু কি ছেলের কাছেও মৃন্ময়ীর অতীত ঘটনা খুলে বলেছে! লজ্জায় লাল হয়ে গেল সে। কঠিন চোখে বাবুনের দিকে চেয়ে বলে, হু টোল্ড ইউ?

বাবুন চাউনি দেখে একটু ভয় পেয়ে অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলে, আই নো। এভরিওয়ান নোজ।

দয়ী বন্ধ দরজা খুলে দিয়ে বলল, আয় দিদি, হয়ে গেছে।

মৃন্ময়ী দরজার কাছ থেকেই দৃশ্যটা দেখে শিউরে ওঠে। ভাঙা ডানা, ছেঁড়া পালক, রক্ত মাখামাখি। ছ'টা বিচ্ছিন্ন মাথা গড়াগড়ি যাচ্ছে একধারে, অন্য ধারে স্তূপাকার মুরগির শবদেহ। মৃন্ময়ী বলল, আহা রে! কষ্ট দিসনি তো ওগুলোকে দয়ী?

কষ্ট কী? মরে বেঁচেছে।

বাবুন তার ছুরি বন্ধ করে পড়ার টেবিলে ফিরে গেছে।

দয়ী মুরগির পালক ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, বাবুনটাকে তোরা কি শাসন করিস না দিদি? ও কীসব যেন বলছিল!

মৃন্ময়ী তার ভেজা এলোচুলে গামছার ঝটকা দিচ্ছিল দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে। থেমে গিয়ে বলল, কী বলছিল?

তোর লাভারের কথা।

মৃন্ময়ী উদাস মুখে বলে, সবাই বলে, ও-ই বা বলবে না কেন?

দয়াময়ী মুখ তুলে কঠিন স্বরে বলে, না, বলবে না। বললে ওর মুখ থেঁতো করে দিবি। তোর ভয় কীসের?

মৃন্ময়ী মাথা নেড়ে বলে, পেটে ধরলে তো হয় না, বাবুন তো আমার নয়। ওর বাবার।

দয়ী কথা বাড়ায় না। অনেক কাজ।

বিকেল হয়ে আসতে না আসতেই মৃন্ময়ী তাড়া দেয়, রান্না তাড়াতাড়ি শেষ কর। হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আয়। আমি শাড়ি বের করে রেখেছি।

আমি সাজব না দিদি। রান্না করতে ডেকেছিলি, করে দিয়ে গেলাম।

শুধু তাই বুঝি? বোকা কোথাকার!— মৃন্ময়ী খুব ভাল মানুষের মতো মুখ করে বলে, কত ভাল ছেলে জানিস না তো! এরকম আর কপালে জুটবে না।

জুটে দরকার নেই।

বলে বটে দয়ী, আবার সাজেও।

বেলা থাকতেই সরিৎ অফিস থেকে ফিরল। মোটা-সোটা নাদুগোপালের মতো চেহারা, কিন্তু কঠিন এক বোকা ব্যক্তিত্ব। দেখলেই মনে হয় এ লোকটা তেমন বুদ্ধিমান নয়, তবে জেদি এবং গোঁয়ার। সব সময়ে মুখে একটা অহংকারী গম্ভীর ভাব। হাসি ঠাট্টা করে না, গল্প জমাতে বা আড্ডা মারতে ভালবাসে না, গান গায় না, বই পড়ে না। তার সব মনোযোগ ছেলের ওপর। অফিস থেকে ফিরে হাতমুখ ধোয়ার আগেই ছেলের পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে, সেদিনকার স্কুলের পড়া দ্যাখে। বিকেল হলে ছেলেকে খেলতে নিয়ে যায় পার্কে। রাত্রিবেলা ফের ছেলেকে পড়াতে বসে। এ জীবনে আর কোনও আনন্দ বা অবকাশের তোয়াক্কা করে না। মৃন্ময়ীর সঙ্গে কদাচিৎ কেউ তাকে কথা বলতে শুনেছে। তবে এও সত্য যে, মৃন্ময়ী সম্পর্কে নোংরা কৌতূহলেরও তার অভাব নেই। এখনও সে মৃন্ময়ী সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়, অতীতের আরও কোনও গুপ্ত ইতিহাস আছে কি না জানার চেষ্টা করে। লোকটাকে আদপেই পছন্দ করে না দয়ী।

সরিৎ ঘরে ঢুকে তোম্বা মুখ করে অবজ্ঞার চোখে একবার দয়ীকে দেখে বলে, কখন এলে?

দয়ী বলল, অনেকক্ষণ।

ভাল।— বলে সরিৎ শোওয়ার ঘরে চলে গেল।

সরিতের চলে যাওয়ার দিকে একরকম ঘৃণা ও আক্রোশভরা চোখে চেয়ে রইল দয়ী।

॥ সরিৎ ॥

বাবুন আজকাল স্কুলের সাপ্তাহিক পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করছে। খাতায় কোনওখানে একটুও দাগ পড়ে না। তার স্কুলটি খুবই ভাল, কলকাতার একেবারে শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলির একটি। সেখানে ছেলে ভর্তি করতে লোককে মাথা কুটতে হয়। সেখানকার বেশির ভাগ ছেলেই ব্রিলিয়ান্ট। তাদের মধ্যেও বাবুন আলাদা রকমের ব্রিলিয়ান্ট। স্কুলের কর্তৃপক্ষ তার দিকে বিশেষ নজর রাখছে। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সে কোনও দারুণ ঘটনা ঘটাতে পারে।

সরিৎ খুব মন দিয়ে বাবুনের স্কুলের খাতাপত্র দেখল। দু'-একটা প্রশ্ন করল। ছেলের সঙ্গে সে কখনও বাংলায় কথা বলে না। বাপ আর ছেলে কেবল ইংরিজিতেই বাক্যালাপ করে। তাতে অভ্যাস ভাল থাকে। তা বলে বাবুন বাংলায় কাঁচা নয়। খাতা দেখে গভীর তৃপ্তির একটা শ্বাস ফেলে বাবুনের দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইল। তখন বাবুন আস্তে করে ইংরিজিতে বলল, আজ মা কাঁদছিল দয়ী আন্টির কাছে।

সরিৎ খুব নিচু গম্ভীর গলায় বলল, কেন?

ঠিক শুনতে পাইনি। বোধহয় বলছিল সবাইকে সে ভয় পায়।

সেটাই পাওয়া উচিত।

দয়ী আন্টি মায়ের পক্ষে।

আমি জানি।

আন্টি বলছিল আমাকে নাকি মারা উচিত।

সাহস থাকে তো মারুক না। বাড়ি থেকে দু'জনকেই বের করে দেব।

সরিৎ রাগে ফুঁসে ওঠে। সমস্ত শরীর জ্বলে যায় তার। এত সাহস কোত্থেকে পায় এরা? এরা তো কোনও দিক দিয়েই তার বা বাবুনের সমকক্ষ নয়। মার্কামারা গুন্ডার মেয়ে। একটা এক মস্তানের সঙ্গে ভেগেছিল, অন্যটা পুরুষ নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। দয়ীর ইতিহাস বেশ কিছুটা জানে সরিৎ। ওদের পাড়ার একটা ছেলে সরিতের ডিপার্টমেন্টে জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার। মাঝে মাঝে সে অনেক খবর দেয়। আগে ভয়ে মুখ খুলত না। কিন্তু তার ভয় ভেঙে দিয়ে মুখ খুলিয়েছে সরিৎই।

গা গরম হয়ে আছে এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে, তার ওপর রাগ। সরিৎ বাথরুমে আজ অনেকক্ষণ শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে স্নান করল। স্নান করতে করতেই ক্ষীণ কলিং বেলের আওয়াজ পেল। বিনয় এল বুঝি!

দয়ীকে আজ এ বাড়িতে ডেকে পাঠানোর মূলে যে একটা ষড়যন্ত্র আছে তা সরিৎ আন্দাজ করেছে। পরশু মৃন্ময়ী যখন টেলিফোন করছিল দয়ীকে তখন বাবুন সবটা শোনে এবং পরে বাবাকে বলে দেয়।

তখনই সরিৎ বলেছিল, চিকেন রয়্যাল মাই ফুট। দে হ্যাভ আদার মোটিভস।

এমনকী বিনয়কে নেমন্তন্ন করার ইচ্ছেও সরিতের ছিল না। সে সামাজিক ভদ্রতা সৌজন্যর ধার ধারে না। বরং বাইরের কোনও লোক বাড়িতে এলে সে বিরক্তি আর অস্বস্তি বোধ করে। সে চায় সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নভাবে থাকতে। এই উটকো ঝামেলা জুটিয়েছে মৃন্ময়ী। একদিন বলল, বিনয়কে আমাদেরও নেমন্তন্ন করা উচিত। প্রেস্টিজের ব্যাপার।

মৃন্ময়ী সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায়। তবে আকাশ বাতাসকে উদ্দেশ করে যা বলার বলে।

শুনে প্রথমে পাত্তা দেয়নি সরিৎ। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছে, মৃন্ময়ী কিছু অন্যায় বলেনি। বিনয় মৃন্ময়ীর জন্য দামি সিনথেটিক শাড়ি আর সেন্ট এনেছে আমেরিকা থেকে, বাবুনকে ভিউ মাস্টার আর সরিৎকে স্যুটের কাপড় দিয়েছে। বিনয় তার পিসতুতো ভাই হলেও তাদের পরিবারেরই মানুষ। পিসিমা ছেলে নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা, বাবা তাকে নিজের পরিবারে এনে রাখেন। সুতরাং কৃতজ্ঞতাবশে বিনয় এটুকু দিতেও পারে। কিন্তু সরিৎ আর একটা কথাও ভেবেছে। তার ইচ্ছে স্কুলের পড়া শেষ করেই বাবুনকে বিদেশ পাঠিয়ে দেবে। বিনয়ের সঙ্গে একটা এ ধরনের কথাও হয়েছে। সুতরাং বিনয়কে একদিন নেমন্তন্ন খাওয়ালে মন্দ হয় না। বাবুন ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও কিছুর ওপর তার তেমন আকর্ষণ নেই। তার যা কিছু স্বার্থ তা বাবুনকে ঘিরে। বাবুনের জন্য সে সব কিছু করতে পারে।

আর একটুক্ষণ জলের ধারার নীচে দাঁড়ালে ভাল লাগত। কিন্তু দেরি করতে মন সরল না। ওদিকে এতক্ষণে বিনয়ের সঙ্গে দয়ীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই মৃন্ময়ী। কিছু বলা যায় না, এলেমদার মেয়ে দয়ী হয়তো প্রথম দর্শনটাই কাজে লাগিয়ে দেবে। ব্যাপারটায় বাধা দেওয়া খুব জরুরি। মৃন্ময়ীর বাড়ি থেকে কোনও মেয়েই আর তাদের বাড়ির বউ করে আনা ঠিক নয়।

পাজামা পাঞ্জাবি পরে সরিৎ বাইরের ঘরে এসে একটু অবাক হয়। বিনয় সোফায় বসে কেবল মৃন্ময়ীর সঙ্গে কথা বলছে। দয়ী কাছে-পিঠে নেই।

বিনয় তার বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলে, তুমি তো এমনিতে স্মোক করো না। এটা একটা খেয়ে দেখবে নাকি? নরম টোব্যাকো।

খুব শখ হলে এক আধটা কখনও-কখনও খায় সরিৎ। তবে ধোঁয়াটা কখনও গেলে না। তাছাড়া ছেলের সামনে সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে তার ভারী সঙ্কোচ। তবু আজ একটা ধরাল। বলল, পাত্রী পছন্দ করেছিস?

কই পাত্রী? কত দেখলাম।

একজনও পাশমার্ক পেল না?

খুঁজে দাও না। আমার তো বেশি সময়ও নেই।

মৃন্ময়ী সরিতের সামনে খুবই অপ্রতিভভাবে বসে ছিল। হঠাৎ বলল, পাত্রী ঠিক পাবে। চিন্তা কোরো না।

হাতে আছে নাকি?— বিনয় জিজ্ঞেস করে। তারপর বলে, রোজ দু'-দশটা করে চুল পেকে উঠছে। থাকলে আর বেশি দেরি কোরো না বউদি। এটাই ইন্ডিয়ান মেয়েদের শেষ চান্স। এখানে পছন্দমতো না পেলে ফিরে গিয়ে একজন আমেরিকানকেই বিয়ে করব।

না না!— খুব সিরিয়াস গলায় প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে মৃন্ময়ী। তারপর সরল মনে বলে দেয়, আমার মেজো বোনকে দেখে যাও। খারাপ লাগবে না।

কই সে?— জিজ্ঞেস করে বিনয়।

আছে। আজ ওর হাতের রান্নাই তো খাবে।

বিনয় অবাক হয় না। বোধহয় নিমন্ত্রণের ছলে এরকম আরও বেশ কয়েকবার তাকে পাত্রী দেখতে হয়েছে। দুটো পা সামনে টান করে মেলে দিয়ে পিছনে হেলে বসে বলে, যাক বাবা বাঁচা গেল। তোমার বোন তো, সে নিশ্চয়ই তোমার মতো ভাল স্বভাবের হবে। না দেখেই ফিফটি পারসেন্ট পছন্দ করছি। এবার ডাকো।

চা নিয়ে আসছে। এই দয়ী।— বলে ডাক দিয়ে উঠে যায় মৃন্ময়ী।

বিশ-বাইশ বছর বয়সে অনেক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিয়ে প্রথম জার্মানিতে গিয়েছিল বিনয়।

দীর্ঘকাল অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ শিখেছে সেখানে। তারপর সুযোগ বুঝে চলে গেছে আমেরিকায়। সাত ঘাটের জল খেয়ে এখন সে প্রবল প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত। মেদহীন রুক্ষ চেহারা, চালচলনে খুব চটপটে, প্রচণ্ড সময়নিষ্ঠ, সরল ও সৎ। জীবনে কোনও কাজে ফাঁকি দেয়নি বিনয়। মস্ত কোনও ডিগ্রি নেই, কিন্তু হাতে-কলমে কাজ করার মহার্ঘ্যতম অভিজ্ঞতা আছে। সরিৎ নিজে ইঞ্জিনিয়ার, সে অভিজ্ঞতার মূল্য বোঝে। সাহেবরা আরও বোঝে। এই খাঁটি ছেলেটির গলার দয়ীকে ঝুলিয়ে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়।

গ্রীষ্মের দীর্ঘ বেলা এমনিতেই সহজে ফুরোতে চায় না, তার ওপর সাততলায় যেন আরও কিছুক্ষণ আলোর রেশ থেকে যায়। সাড়ে ছ'টা বেজে যাওয়ার পরও ঘরের আলো জ্বালাবার তেমন দরকার পড়ছে না। কিন্তু মৃন্ময়ী আলো জ্বালল। দপদপ করে লাফিয়ে জ্বলে ওঠে দু'-দুটো স্টিক লাইট আর একটা একশো পাওয়ারের বালব।

অপ্রতিভ হাসিমুখে মৃন্ময়ী বলে, এই আমার বোন দয়াময়ী।

ট্রে হাতে দয়াময়ী এগিয়ে আসে লঘু পায়ে। খুব যে সেজেছে তা নয়। চালাক মেয়ে, সাজতে জানে। হালকার ওপর প্রসাধনের সামান্যতম প্রলেপ দিয়েছে মাত্র। পরনে তাঁদের সাদা খোলের শাড়ি। কিন্তু শাড়িটার নকশাওয়ালা পাড় এতই চওড়া যে জমি প্রায় ছাড়ই পায়নি। তাছাড়া আছে সুন্দর মস্ত মস্ত বুটির কাজ। ব্লাউজটা খুবই তুচ্ছ একটা ন্যাকড়া মাত্র। এত ছড়িয়ে কাটা যে পুরো কাঁধ, পিঠ এবং স্তনের ঢেউ পর্যন্ত অনেকখানি দেখা যায়। আদুড় রয়েছে পেটের অনেকটা অংশ। দেখে চোখ সরিয়ে নেয় সরিৎ। সিগারেটে মৃদু টান দেয় এবং আনাড়ির মতো ধোঁয়া ছাড়ে।

দয়াময়ীকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল বিনয়। দু'হাত জড়ো করে খুব গভীর আন্তরিকতায় ভরা নমস্কার জানিয়ে বলে, ভারী খুশি হলাম পরিচয় হয়ে।

দয়ী খুব চমৎকার একটা স্মার্ট হাসি হেসে বলে, ওটা তো গ্ল্যাড টু মিট ইউ-এর অনুবাদ। আমাকে দেখে খুশি হওয়ার কিচ্ছু নেই। আমি একদম খারাপ। জামাইবাবুর কাছে হয়তো আমার অনেক নিন্দা শুনবেন।

কথাটা বলে একঝলক তাকায় দয়ী। সেই দৃষ্টিটা বুলেটের মতো লাগে সরিতের বুকে। এটা কি দয়ীর খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ? খুবই চালাক মেয়ে। মৃন্ময়ীর মতো বোকা আর সরল নয়। ও আঁচ করে নিয়েছে, জামাইবাবু এ বিয়ে আটকানোর চেষ্টা করবে।

বিনয় মৃদু হাসছিল। বলল, বুধোদার মুখে বড় একটা নিন্দে শুনিনি কারও। তাছাড়া আপনি তো অনিন্দ্য।

সরিতের ভিতরে মৃদু দহন শুরু হয়। খুব ধীরে ধীরে জেগে ওঠে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা। খুব আনাড়ির মতো আর একবার ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে করেই বলে, আমিও তাই বলি। ওর নিন্দে করবে কে? দয়ীর কত অ্যাডমায়ারার!

বিনয় হাসিমুখে দয়ীকে বলে, আপনার অ্যাডমায়ারারদের লিস্টে আজ থেকে আমাকেও ধরে রাখুন।

সরিৎ চায়ে চুমুক দিতে দিতে স্ট্র্যাটিজিটা ভেবে নিল। তারপর আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলল, দয়ীর অ্যাডমায়ারারদের মধ্যে হাজার রকমের ভ্যারাইটিও আছে। প্রায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। ছাত্র, অধ্যাপক, রাজনীতির মস্তান, পাড়ার গুন্ডা, বুড়ো কামুক, কে নয়? ও প্রায় কাউকেই হতাশ করে না।

বলে কথাটার প্রতিক্রিয়া দয়ীর মুখে খুঁজে দ্যাখে সরিৎ। দয়ী তার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তাতে ভয় নেই, অপ্রতিভতা নেই, আছে ভীষণ রকমের একটা ঘেন্না। সরিৎ আপনমনে হাসল। খুশি হল সে। এরকমটাই সে চায়।

ঘরের মধ্যে একটা অস্বস্তির হাওয়া বইছে। বিনয় যতদূর সম্ভব নির্বিকার মুখে আস্তে করে বলে, বাবুনকে দেখছি না।

ডাইনিং টেবিলের পাশে কাঠের পর্দাটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে মৃন্ময়ী। প্রবল হতাশায় নীচের ঠোঁট ওপরের দাঁতে কামড়ে ধরছে মাঝে মাঝে। সে আজকাল রাগ করতে ভয় পায়। তার আছে কেবল হতাশা।

দয়ী সবশেষে নিজের কাপে চা ছেঁকে নিচ্ছিল মাথা নিচু করে। বিনয়ের কথার জবাবে বলল, বাবুন বোধ হয় ছাদে। দাঁড়ান, ডেকে আনছি।

তার দরকার কী? খেলছে খেলুক। চলুন বরং আমরাই একটু ছাদ থেকে ঘুরে আসি। গরমে বসতে ইচ্ছে করছে না এখানে।— বলে বিনয় একটু নড়ে বসে।

এই কথায় সরিৎ নিজের ভিতরে একটা পরাজয় টের পায়। ওরা ছাদে যাবে? তার মানে তো অনেকখানি। সে একবার দয়ীর দিকে তাকায়। দয়ীও ঠোঁটে ধরে থাকা পেয়ালার কানার ওপর দিয়ে একঝলক তাকায় সরিতের দিকে। সেই চোখে জয়ের ঝিকিমিকি।

যেন কিছুই ঘটেনি এমন শান্তস্বরে সরিৎ বলল, দয়ী, তোমার সেই অ্যাডমায়ারারটির কী যেন নাম! মলয় না? ওঃ বিনয়, সে ছেলেটা দয়ীর জন্য যা পাগল না! যে কাউকে খুন করতে পারে ছোকরা। ছেলেটা কিলার টাইপেরই। নকশাল ছিল। ছোকরার দোষও নেই। দয়ীর সঙ্গে নাকি ডাকবাংলো-টাংলোয় রাত-টাতও কাটিয়েছে। কাজেই এখন তার অধিকারবোধ জন্মেছে।

সিনেমা থিয়েটারে যেমন ফ্রিজ শট বা দৃশ্যের চলন হয়েছে আজকাল, সরিৎ লক্ষ করল, ঘরের তিনটে প্রাণী তেমনি নিথর শিলীভূত হয়ে গেল।

সেই অনড় দৃশ্যের মধ্যে প্রথম নড়ল বিনয়। আস্তে করে বলল, বুধোদা ইউ শুড নট...

কথাটা শেষ করল না বিনয়। সরিৎ আর একটা সিগারেট ধরায়। তারপর বলে, আমি জাস্ট সিচুয়েশনটা জানিয়ে রাখছি। আমি কিছু ভুল বলিনি তো দয়ী?— বলে সরিৎ দয়ীর দিকে তাকায়।

দয়ীর হাত সামান্য কাঁপছে। চলকাচ্ছে কাপের চা। বুদ্ধিমতী দয়ী কাপটা রেখে দিল টি-পয়ে।

তারপরই হঠাৎ হাসিমুখ তুলে বিনয়কে বলল, ছাদে যাওয়ার কথা ছিল যে! যাবেন না?

বিনয় ধেয়ে-পেয়ে উঠে পড়ে। বলে, নিশ্চয়ই।

দয়ী চিমটি কাটা হাসি হেসে বলে, এ ঘরটা বড্ডই গরম।

দু'জনে প্রায় ঘরবন্দি পাখির মতো হঠাৎ একটু ফোকর পেয়ে প্রাণপণ পাখা ঝাপটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সরিৎ জানে, আজ রাতে দয়ী কাঁদবে। মেয়েরা অপমানিত হলে কাঁদে, দোষ ধরা পড়লে কাঁদে। ও কাঁদবে।

সরিৎ তৃপ্ত মনে চায়ের তলানি শেষ করে পট থেকে আরও এক কাপ ঢেলে নেয়। চা-টা এবার ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, কিন্তু লিকার আরও গাঢ়, চনমনে।

ঘরে যে আর কেউ আছে তা গ্রাহ্যই করেনি সে। কিন্তু না থেকেও মৃন্ময়ী আজ ছিল। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বলল, দয়ীর অত খবর তুমি জানলে কী করে?

সরিৎ তার স্ত্রীর দিকে পারতপক্ষে তাকায় না। তার সামনেই বিশাল দেওয়ালজোড়া দরজাটা খোলা। বাইরে আকাশে তখনও খানিকটা পাঁশুটে আলো। সে তাই দেখছিল। চোখ না ফিরিয়েই বলল, প্রমাণ আছে।

মৃন্ময়ী অবাক হয়ে বলে, কীসের প্রমাণ? দয়ী আমার মতো নয়।

তোমরা সবাই সমান। এখন বেশি কথা বোলো না, আমার ভাল লাগছে না।

মৃন্ময়ী হয়তো ভয় পেল, তবু আজ ছাড়ল না। দয়ীর পরিত্যক্ত সোফায় বসে বলে, বিয়েটা তো ভেঙেই দিলে, তাহলে আর বলতে দোষ কী?

সরিৎ বহুকাল বাদে মৃন্ময়ীর দিকে একবার তাকায়। পরমুহূর্তেই ফিরিয়ে নেয় চোখ। আজকাল তার কী যে হয়েছে, কারো চোখেই দু' দণ্ড চোখ রাখতে পারে না। আপনা থেকেই চোখ ফিরে

আসে। সরিৎ অন্যদিকে তাকিয়ে টবের মানিপ্ল্যান্ট দেখতে দেখতে বলে, মলয়ের লেখা একটা চিঠি আমার হাতে এসেছে।

মৃন্ময়ী বলল, কী করে এল?

তাতে তোমার দরকার কী? এসেছে যেভাবেই হোক।

মৃন্ময়ী একটুক্ষণ ভাবে। তারপর বলে, মলয়কে আমি চিনি। দয়ীর বন্ধু। আজকাল বন্ধুদের মধ্যে ওসব হয় না।

সবই হয়।

চিঠিটা আমাকে দেখাবে?

সরিতের এবার বুঝি একটু লজ্জা করে। বলে, দেখার কিছু নেই। যা বলেছি তা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারো।

মৃন্ময়ী খুব নিবিড় চোখে লক্ষ করছে সরিৎকে। বলে, অবিশ্বাস করিনি। শুধু দেখতে চাইছি। একটা কারণ আছে।

কী কারণ?

ক'দিন আগে বাবুনকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ট্যাক্সিতে বাবুন সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল। তখন পকেট থেকে ভাঁজকরা একটা কাগজ বের করে পড়ছিল দেখেছি। আমি কিছু বুঝতে পারিনি তখন। মলয়ের চিঠি কি বাবুনই তোমাকে এনে দিয়েছে?

সরিৎ আর একবার স্ত্রীর দিকে তাকানোর চেষ্টা করল, কিন্তু এবার তাকাতেই পারল না। তবে গলায় প্রচণ্ড ঝাঁঝ তুলে বলল, দিলে কী করবে? মারবে?

তা কেন? বাবুনকে মারব সে সাধ্যি কি আমার আছে?

সাধ্যি না থাকাই মঙ্গল। দয়ীকেও সেটা বুঝিয়ে দিয়ো। ও নাকি আজ বাবুনকে মারার কথা তোমাকে বলছিল। ওকে বলে দিও ওর বাপ যত বড় গুন্ডাই হোক আমার বাবুনের গায়ে যদি কেউ হাত তোলে তার হাতখানা আমি কেটে দেব।

মৃন্ময়ী খুবই বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এ কথার কোনও জবাব দিল না। সরিতের হঠাৎ চাগিয়ে-ওঠা রাগটা পড়ে যাওয়ার জন্য সময় দিল। তারপর বলল, বাবুনকে কেউ মারবে না। এখন বলো তো, চিঠিটা কি বাবুন তোমাকে চুরি করে এনে দিয়েছিল?

চুরি করতে যাবে কেন? সাম হাউ অর আদার চিঠিটা ওর হাতে এসে গিয়েছিল, ও পকেটে করে নিয়ে এসে আমাকে দেয়।

অন্যের চিঠি জেনেও সেটা আনা কি বাবুনের উচিত হয়েছে?

সে বিচার আমি করব। বাবুন কিছু অন্যায় করেনি। চিঠিটা সে আমার হাতেই এনে দিয়েছে।

তা হোক, তবু সেটা অন্যায়। তুমিই বা দয়ীর চিঠি পড়তে গেলে কেন? কেন বাবুনকে শাসন করলে না?

সরিৎ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে, দয়ী যা করে বেড়াচ্ছে সেটা বেশি অন্যায়, না চিঠি পড়াটা বেশি অন্যায়? এই বাজে ক্যারেকটারের মেয়েটাকে আমার ভাইয়ের গলায় ঝোলাতে চাইছ, সেটাও কি অন্যায় নয়?

সরিতের চিৎকারে মৃন্ময়ী মিইয়ে গেল। সরিৎ লাল হয়ে যাচ্ছে রাগে, ঠোঁটে ফেনা জমছে, কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল মৃন্ময়ী। তারপর আস্তে করেই বলল, দয়ীর কথা নাই বা ভাবলে। ও খারাপ ভাল যাই হোক, তোমার বা বাবুনের দিকটা তো ভাববে! ও কেন চিঠিটা পড়ল? কত বাজে কথা থাকে প্রেম ভালবাসার চিঠিতে। ও সেগুলো পড়েছে ভাবতেই যে গা ঘিনঘিন করে।

অন্য হাতে টর্চ। একেবারে কাছাকাছি এসে ছোকরা আমাকে দেখে হয়তো থমকে গিয়েছিল। দপ করে টর্চের আলো মুখে ফেলে মুখটা চিনে নিয়েই একদম পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করলাম। ফাঁকা মাঠে গুলির শব্দটা প্রায় শোনাই গেল না। ছোকরা কোঁস করে একটা শব্দ করে কুঁকড়ে পড়ে গেল। আর দেখার কিছু ছিল না। মুখ ফেরাতেই দেখি আমার পিঠ ঘেষে দয়ী দাঁড়িয়ে আছে। স্থির-চোখে কিছুক্ষণ ছোকরার মৃত্যুযন্ত্রণার ছটফটানি দেখল, তারপর আমার দিকে মুখ ফেরাল। শান্ত মুখ, চোখে সম্মোহিত মুগ্ধ দৃষ্টি। আমার ভয় ছিল, দয়ী হয়তো চেঁচামেচি করবে, অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যাবে। আশ্চর্য, তার কিছুই হল না। আমি স্পট থেকে কখনও দৌড়ে পালাই না। তাতে বেশি বিপদ ঘটে। খুব স্বাভাবিক চালে একটু ঘুরপথ হয়ে আমরা বড় রাস্তায় উঠলাম এবং যেন বেড়িয়ে ফিরছি ঠিক এমনভাবে বাজারের ভিতর দিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। পথে একটা চায়ের দোকানে বসে চাও খেলাম। কপাল ভাল বলতে হবে। খুনটা নিয়ে হই-চই হলেও আমাকে কেউ সন্দেহ করেনি। করার কারণও ছিল না। গিধনিতেও তখন দু' দঙ্গলে ঝগড়াঝাঁটি মারপিট চলছিল কী নিয়ে। সন্দেহ গিয়ে পড়ল বোধহয় সেই ছোকরার উলটো দলের ওপর। সে যাকগে। সেই রাতে দয়ী আমাকে শরীর দিয়েছিল। কিন্তু আমার সেদিন একরত্তি ইচ্ছেও ছিল না। মনটা ভার ছিল। এই প্রথম আমি নন-পলিটিক্যাল কারণে, কেবলমাত্র একটা মেয়েকে খুশি করতে একজনকে মারলাম। কিন্তু দয়ীর হল উলটোরকম। সেই রাতের মতো খুশি, আনন্দিত এবং উত্তেজিত দয়ীকে আমি আর কখনও দেখিনি। মনে মনে সেইদিনই ঠিক করি, দয়ীর পুরো সাইকোলজিটা আমাকে জানতে হবে। সারাজীবন ধরে বিশ্লেষণ করে, গবেষণা করে আমি দেখব দয়ীর জেনারেশনের মেয়েরা কতখানি নষ্ট হয়ে গেছে। রুকু, দয়ীকে আমার ছাড়া চলে না। আমার কাছে ওর অনেক ঋণ। আমি ওকে ভালবাসি বা না বাসি দয়ীকে আমি অনেক দাম দিয়ে কিনে নিয়েছি। ব্যাপারটা হয়তো তুই ঠিক বুঝতে পারবি না। ইউ আর এ ব্র্যান্ডেড রোমান্টিক মাস্টারবেটার।

এবার রুকু আর ততটা অপমান বোধ করল না। কানটা লাল হল, মাথা নুয়ে এল ঠিকই, তবু মনে হল, মলয় তাকে এরকম অপমান করার অধিকার রাখে।

॥ রুকু ॥

রাতে রুকুর ভাল ঘুম হল না। শেষ রাতে সে একেবারেই জেগে গেল। এই এজমালি বাড়িতে ছাদে ওঠা বারণ, বারান্দা নেই। ফলে বাইরেটা দেখতে হলে সদর খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়।

ঘামে ভেজা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রুকু। মাথাটা বড্ড গরম। পাগলের মাথায় যেমন হাজারও ছেঁড়া টুকরো স্মৃতি ও কথা ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে বেড়ায় তার মাথাটাও আজ অমনি। আধো-ঘুমে বারবার একটা সুরে বাঁধা গানের লাইন ঘুরে বেড়াচ্ছিল মাথায়— ধুলায় হয়েছে ধূলি। ধুলায় হয়েছে ধূলি। কোন গানের লাইন তাও ঠিক মনে নেই। এখন জেগেও সে টের পাচ্ছে, প্রচণ্ড একটা বিষণ্ণতায় ভারাক্রান্ত তার মাথা ভাঙা রেকর্ডে পিন আটকে যাওয়ার মতো গানের সেই কলিটা জপ করছে, ধুলায় হয়েছে ধূলি।

মলয়ের মতো রুকুর কোনও যৌন-জীবন নেই। সে কখনও মেয়ে-মানুষের স্বাদ পায়নি। বরাবরই সে ভিতু, লাজুক। কলকাতায় এসে তার মেয়ে বন্ধু জুটেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কারও খুবই ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। কিন্তু কী এক আশ্চর্যজনক কারণে তার ব্যক্তিগত যৌনক্ষুধাকে আজও অধিকার করে আছে সেই কবেকার সামান্য একটি মৃত মেয়ে তাপসী। এই অস্বাভাবিকতার কোনও ব্যাখ্যাও সে খুঁজে পায় না। কিন্তু বুঝতে পারে, এটা এক ঘোর বিকৃতি। বুদ্ধিমান মলয় সেটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল।

নিজেকে নিয়ে আজ ভারী মুশকিল হল রুকুর। এই ভোরের পরিষ্কার সুন্দর পরিবেশে সদর খুলে সে রাস্তায় পায়চারি করতে করতে কেবলই চাইছে রুকুর সঙ্গে সহাবস্থান ছিন্ন করতে। নিজেকে সে সহ্য করতে পারছে না মোটেই। বড্ড ছোট লাগছে, তুচ্ছ লাগছে, হাস্যকর মনে হচ্ছে।

সকাল হলে রুকু যখন দাড়ি কামাতে বসল তখন ছোট আয়নায় আজ বড় শীর্ণ ও লাবণ্যহীন দেখল নিজেকে। চোখ কোটরাগত, গাল বসা, দৃষ্টিতে দীপ্তি নেই।

কিছুই ভাল লাগল না আজ।

অফিসে এসে সে ফোন করল দয়ীকে।

দয়ী, আমি রুকু।

বলো।

মলয়ের সঙ্গে দেখা করেছি।

দয়ী খুব সিরিয়াস গলায় বলল, মলয় কিছু বলল?

সে অনেক কথা। এ কাজটার ভার আমাকে দিয়ে তুমি ভাল করোনি। মলয় কাল আমাকে খুব অপমান করেছে।

তোমাকে? তোমাকে অপমান করবে কেন? তুমি তো কিছু করোনি!

রুকু আচমকা জিজ্ঞেস করে, তুমি কোনওদিন মলয়ের সঙ্গে গিধনি গিয়েছিলে দয়ী?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় দয়ী বোধহয় একটু থতমত খায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, শুধু গিধনি কেন, আরও অনেক জায়গায় গেছি।

রুকু সামান্য ধৈর্য হারায়। বিরক্তির স্বরে বলে, কথাটা এড়িয়ে যেয়ো না দয়ী। তুমি যে মলয়ের সঙ্গে অনেক জায়গায় গেছ সে আমি জানি, তুমিও বহুবার বলেছ। তবু আমি পার্টিকুলারলি গিধনির কথাটা জানতে চাই।

দয়ী সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কোনও কারণে রেগে আছ রুকু? তোমাকে আমি কখনও রাগতে দেখিনি, মাইরি বলছি।

রুকু একটু লজ্জা পায়। গলা নামিয়ে বলে, রেগেছি কে বলল?

গলা শুনে মনে হচ্ছিল। মলয় কি তোমাকে খুব অপমান করেছে? দেখা হলে ওকে বলব তো।

কিছু বোলো না দয়ী, প্লিজ।— কাতর স্বরে বলে রুকু।

দয়ী একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি গিধনির কথা কী জানতে চাইছিলে?

রুকু সতর্কভাবে তার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেয়। ফোনের কাছাকাছি কেউ নেই। কেউ শুনছে না। একটু চাপা গলায় সে বলে, গিধনিতে তোমাকে খুশি করার জন্য মলয় একটা মার্ডার করেছিল দয়ী, মনে পড়ে?

মার্ডার!— দয়ী আকাশ থেকে পড়া গলায় বলে ওঠে, মার্ডার? কী বলছ তুমি?

রুকু একটু ঘাবড়ে যায়। তারপর মিনমিন করে বলে, সেখানে শালবনে নাকি তোমাদের সঙ্গে একদল ছেলের গণ্ডগোল হয়েছিল?

দয়ী অবাক গলায় বলে, তা তো হয়েছিলই। ছেলেগুলো আমাকে আওয়াজ দেওয়ায় ঝগড়া লাগে। আমি একটা ছেলেকে চটিপেটা করেছিলাম। ওরা আমাদের ঘিরে ধরেছিল।

তারপর কী হয়েছিল দয়ী?

কী আবার হবে! সেই রাত্রে অপমানে আমি খুব কেঁদেছিলাম।

মলয়কে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলোনি?

বলেছি। তাতে কী ?

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় মলয় কি ছেলেদের সর্দারকে গুলি করে মারেনি?

স্নান করে খেয়ে অফিসে বেরোনোর সময়ে সে আকাশের পশ্চিম ধারে পিঙ্গল ঝোড়ো মেঘ দেখতে পেল। বাতাস কিছু জোরালো, খুব ধুলো উড়ছে। কয়েকদিনই পর পর বৃষ্টি হয়ে গেছে কলকাতায়। যেখানে বৃষ্টির দরকার সেখানে অর্থাৎ গ্রামে-গঞ্জে তেমন হচ্ছে না।

ভ্রু কুঁচকে কথাটা ভাবতে ভাবতে সে তাদের বড় গ্যারাজে ঢুকে মোটর-সাইকেলটা হিঁচড়ে বের করল। প্রচণ্ড ভারী আর বিপুল চেহারার এই জগদ্দলটা যে প্রাণ পেলে কী ভীষণ গতিতে ছুটতে পারে তার ধারণাই অনেকের নেই; মোটর-সাইকেলে স্টার্টারে পা রেখেই সে প্রশান্ত আত্মতৃপ্তি বোধ করে।

ঝোড়ো হাওয়া আসছে, বৃষ্টির গন্ধে মাখামাখি বাতাস। পারবে কি সে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টেরিটিবাজারের অফিসঘরে পৌঁছোতে?

ক্র্যাশ হেলমেটটা মাথায় এঁটে নিয়ে স্টার্টারে লাথি মারে মলয়। খিদিরপুরের ঘিঞ্জি পেরিয়ে রেসকোর্সের গা ঘেঁষে অর্ধবৃত্তাকার চওড়া ফাঁকা রাস্তার ওপর হোন্ডা পৃথিবীর সব গতিকে যেন ছাড়িয়ে গেল। আইনস্টাইন বলেছেন, আলোর গতি প্রাপ্ত হলে যে-কোনও বস্তুই পর্যবসিত হয়। মলয় তেমনি এই বিদ্যুতের গতিতে যেতে যেতে তড়িতায়ত হয়ে গেল। সে আর তার মোটর-সাইকেল দু'য়ে মিলে যেন একটিই প্রাণ এক সত্তা। অবশ্য কলকাতার রাস্তায় গতির সুখ বড়ই ক্ষণিক। ডালহৌসি ঘুরে লালবাজার স্ট্রিট দিয়ে এসে সে ধরল বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট। নাজ সিনেমার কাছাকাছি বাঁ হাতের গলিতে খানিক গিয়ে এক মস্ত পুরনো বাড়ি। ভিতরে এক বাঁধানো চত্বর ঘিরে বড় বড় টিনের গুদামঘর। সামনের দিকে পাঁচতলা বাড়ির তেতলায় তার অফিসঘর চত্বরে মোটর-সাইকেল রেখে ওপরে ওঠে মলয়।

সে না থাকলে অফিস সামলাবার দায়িত্ব পুণ্যর।

তাকে দেখে পুণ্যর সদাবিষণ্ণ মুখে ভাব একটুও বদলাল না। রোগা কালো ছোটখাটো নিরীহ পুণ্য লোহার চেয়ারে পা তুলে বসেছিল। মলয়কে দেখে শুধু পা দুটো নামিয়ে বসল।

মলয় জিজ্ঞেস করে, সব খবর ভাল তো?

হুঁ।

কে কে এসেছিল লিস্ট করে রেখেছ?

হুঁ।

দেখি।

পুণ্য একটা বাঁধানো একসারসাইজ বুক এগিয়ে দেয়। মলয় দেখতে থাকে। শেষ পৃষ্ঠায় নামের বদলে ছোট একটু লেখা: তোর সঙ্গে দরকার ছিল। আজ বিকেলে অফিসে থাকিস। রুকু।

মলয় তার হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে সস্তায় কেনা রিভলভিং চেয়ারে বসল। বলল, জল।

বশংবদ পুণ্য নিঃশব্দে উঠে গিয়ে বারান্দায় রাখা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনে কাচের গ্লাসে। জল খেয়ে মলয় বারোয়ারি বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বসে এবং পুণ্যর দিকে কয়েকপলক তাকায়। কী করে পুণ্য এক হাতে গ্লাস ধরে সেই হাতেই জল গড়িয়ে আনে তা কখনও দেখেনি মলয়। তবে দরকার হলে মানুষ সবই পারে। কিছুকাল আগেও সে দেখেছিল কনুই থেকে দু' হাত কাটা একটা লোক দুরপাল্লার ট্রেনে সোডা লেমনেড ফেরি করছে। মস্ত ভারী লেমনেড বোঝাই ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সে চলন্ত গাড়ির এ কামরা থেকে ও কামরায় অনায়াসে যাতায়াত করত, ওই দুটো ঠুঁটো হাতেই বোতলের ঢাকনা খুলে স্ট্র ভরে লেমনেডের বোতল ধরত খদ্দেরের মুখের সামনে, পয়সা গুনে নিয়ে গেঁজেতে ভরে রাখত। পুণ্যর তো তবু একটামাত্র হাত নেই।

যে-সব গাঁয়ের ছেলে ভাল করে না বুঝেই পলিটিকসে নেমেছিল, পুণ্য তাদের একজন। খড়্গপুর-কাঁথি রাস্তায় নারায়ণগড়ে তার বাড়ি। বেশ ভাল ছবি আঁকত, তবলা বাজানোর হাত ছিল,

কমার্স স্ট্রিমে সেকেন্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কাঁথি কলেজে ভর্তিও হয়েছিল সে। একদিন ভাবের বশে দশক মুক্তির আন্দোলনে নেমে পড়ল। প্রতিপক্ষের বোমায় ডান হাতটা উড়ে যাওয়ার পর থামল এবং টের পেল, ডান হাতের সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে গেছে তার ছবি আঁকা, তবলা বাজানো, লেখাপড়া এবং রাজনীতি। ক্ষত শুকিয়ে ওঠার পরও বেশ কয়েক মাস পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল পুণ্য। বেশ কয়েক বছর আগে আহত পুণ্যকে কাঁথি হাসপাতালে দেখে এসেছিল মলয়। পরে যখন সার আর কীটনাশকের ব্যবসাদার হয়ে সে আবার নারায়ণগড়ে যায় তখন দেখে, আধপাগলা পুণ্য বসে থাকে সারাদিন রাস্তার ধারের এক চায়ের দোকানের বেঞ্চে। কথা বলে না, বিড়বিড় করে আর লোক দেখলেই মাথা নিচু করে মুখ লুকোয়।

মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখলেই মলয় গলে পড়ে না বা বিমর্ষ হয় না। তার মন অত নরম তো নয়ই, বরং সে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বোমা মেরে কমিয়ে ফেলারই পক্ষপাতী। পুণ্যর অবস্থা দেখে তার মোটেই দুঃখটুঃখ হয়নি। তবে তার কেমন মনে হয়েছিল আধ-পাগলা লোকেরা বড় একটা অসৎ হয় না। তাই পুণ্যকে তুলে আনল মলয়। একশো টাকা মাইনে দিত। এমনিতে পুণ্য তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। হিসেবে ভুল করে, অনেক কথা ভুলে যায়, অন্যমনস্ক থাকে। তবে পুণ্যর ধ্যানজ্ঞান এই অফিসটাই। একদিন সে মলয়কে বলল, আপনাদের বেয়ারাটাকে ছাড়িয়ে দিন না, জল চা আমিই দিতে পারব। মাইনে কিছু বেশি দিতে হবে। মলয়ের তাতে আপত্তি হয়নি। আগে বাইরে থেকে চা আসত। পুণ্য এখন সে পাট তুলে দিয়ে একটা জনতা স্টোভ আর চায়ের সরঞ্জাম কিনে নিয়েছে। বাইরের দিককার বারান্দার কোণে একটু টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা জায়গা করে এক হাতে দিব্যি চা বানায়। তার জন্য আলাদা পয়সা নেয়। মলয়ের কোনও আপত্তি নেই। এই অফিসেই চব্বিশ ঘন্টা থাকে পুণ্য। লোহার আলমারির পিছনে চটে জড়ানো তার একটা বিছানা আছে। রাতে হাফ সেক্রেটারিয়েটের ওপর বিছানাটা পেতে কুঁকড়ে শুয়ে থাকে। দুশো টাকার মতো আয় করে। তা থেকে অর্ধেক বাড়িতে পাঠায়। অপদার্থ পুণ্যর এটাই ঢের সাফল্য।

নামের লিস্ট ধরে ধরে মলয় কয়েকটা টেলিফোন করে। বেশির ভাগই কাজ-কারবারের কথা। সবশেষে ফোনটা করল রুকুকে। বার চারেক ডায়াল করার পর পেল।

রুকু, তুই এসেছিলি?

হ্যাঁ, একটু দরকার ছিল।

কী দরকার?

গিয়ে বলব।

বিকেলে আমি হয়তো অফিসে থাকব না। দিন সাতেক ছিলাম না, অনেকগুলো অর্ডার পিছিয়ে আছে।

কিন্তু টেলিফোনে তো বলা যাবে না।

কথাটা কী নিয়ে তা তো বলবি?

দয়ী।

দৈ? কীসের দৈ?

দয়ী দয়ী। দয়াময়ী।

ওঃ। দয়ীর আবার কী হল?

সেটাই তো বলতে আসব।

ধ্যাৎ। সিরিয়াস কিছু থাকলে বল। মেয়েছেলে নিয়ে কথা বলার কী আছে! ইজ এনিথিং রং?

একটু দ্বিধা করে রুকু বলে, তেমন কিছু নয়। আমি আসছি আজ। তুই থাকিস।

বলছি তো, থাকার অসুবিধে আছে।

রুকু একটু হাসল। বলল, অসুবিধে হলেও বোধহয় তোকে থাকতেই হবে। বাইরের দিকে চেয়ে দ্যাখ কী ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে।

বাস্তবিকই মলয় চোখ তুলে দেখল বাইরে পাঁশুটে আলো। ধুলোর ঝড়ের সঙ্গে এইমাত্র বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি এল। মলয় বলল, ইডিয়েট। বৃষ্টি হলে আমি না হয় বেরোতে পারব না, কিন্তু তুই-ই বা বেরোবি কী করে? আমার অফিসে তোকে তো আসতে হবে।

রুকু একটু চুপ করে থেকে বলে, সেটাও কথা। তবু তুই থাকিস। দয়ী আমাকে ওর পক্ষের উকিল হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে। মক্কেলকে ফেরাতে পারিনি।

কিন্তু মামলাটা কীসের?

গিয়ে বলব। জানিস তো অফিসের টেলিফোন খুব সেফ নয়।

জ্বালালি। আচ্ছা আয়।

বলে ফোন রাখল মলয়। বস্তুত বন্ধুদের মধ্যে রুকু তার সবচেয়ে প্রিয়। তার প্রিয় হওয়ার মতো কোনও কারণ রুকুর নেই। কোনও বিষয়েই তাদের মেলে না। রুকু শান্ত, চিন্তাশীল, রাজনীতি থেকে শত হাত দূরের লোক, হীনমন্যতায় ভোগে। তবু প্রিয়। বোধহয় অসহায় বলেই প্রিয়।

ঝড়বৃষ্টির দামাল ঝাপটা থেকে ঘর বাঁচাতে পুণ্য গিয়ে বারান্দার দরজাটা বন্ধ করল। ঘরের পাখাটা মলয় না বলতেই চালিয়ে দিল। কিন্তু পাখা ঘুরল না। কারেন্ট নেই। কিন্তু সেটা লক্ষ করল না মলয়।

মলয় ভ্রু কুঁচকে নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে থাকে। আজ আর কাজ কিছু হবে না। বৃষ্টিতে কোনও পার্টিই আসবে না। একঘেয়ে অফিসঘরে বন্দি থাকার মতো শাস্তি তার কাছে আর কিছু নেই।

না বলতেই খুব বিনীত ভঙ্গিতে চা করে নিয়ে এল পুণ্য। মলয় ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকায়। পুণ্যর সঙ্গে আড্ডা মারার চেষ্টা বৃথা। কথা বললে অর্ধেকের জবাব দেয় না, বাকি অর্ধেকের জবাব দেয় হুঁ হ্যাঁ না করে। বেশ বোকাও আছে পুণ্য, তার ওপর পাগল। মলয় কথা বলার চেষ্টা করে না ওর সঙ্গে, শুধু কী করতে হবে তা বলে দেয়। পুণ্য সব সময়েই আদেশটা পালন করে। ও শুধু হুকুম তামিল করতে জানে।

মলয় চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, আলোটা জ্বালিয়ে দাও।

জ্বালানোই আছে। কারেন্ট নেই। পুণ্য মাথা নিচু করে বলে।

এই ঝড়বৃষ্টির দুপুরে আর কেউ না আসুক, যে মারোয়াড়ি ছোকরা তার ব্যবসায় টাকা খাটাতে চাইছে সেই সইকুমার এসে হাজির। বর্ষাতিটা দরজার কোনায় টাঙিয়ে ঘরে এল। 'হাই' বলে মারকিন কায়দায় উইশ করে চেয়ার টেনে বসল। খুবই দামি ঝকঝকে হাওয়াই শার্ট আর ট্রাউজারস পরনে। বৃষ্টিতে একটু ভিজেছে। সইকুমার বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাই জানে, কিন্তু কথা বলে ইংরিজিতে। কলকাতার ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছেলেমেয়েরা যেমন বদহজমের মতো গোল্লা গোল্লা ইংরিজিতে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে কথা বলে তেমনি তার ইংরিজি। বলা বাহুল্য, সইকুমারও মধ্য কলকাতার এক নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছিল। তবে পরবর্তীকালে সে কয়েকবার বিদেশেও ঘুরে এসেছে। সে প্যারিস আর টোকিয়োর মেয়েমানুষদের কথা বলতে ভালবাসে।

সইকুমার বসেই বলল, আই ওয়েন্ট টু ব্যান্ডেল লাস্ট উইক। গট এ গুড সাইট ফর ইয়োর ল্যাবরেটরি। এ লিটল ওভার ফিফটিন থাউস্যান্ড অ্যান্ড এক্সপেনসেস।

মলয় কথা বলল না। তাকিয়ে রইল।

সইকুমার টেবিলে কনুই রেখে ঝুঁকে বসে মলয়ের দিকে খুব বন্ধুর মতো তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে। তারপর বলে, ইউ আর গেটিং কোয়াইট বিগ অর্ডার্স। হোয়াই ডোন্ট ইউ টেক সাম এফিসিয়েন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টস? দ্যাট হাফ উইট অব ইয়োরস, দ্যাট বাস্টার্ড পুণ্য ইজ গুড ফর নাথিং। আই কেম

লাস্ট ইভনিং টু আস্ক অ্যাবাউট ইউ অ্যান্ড দ্যাট ইডিয়ট অফ এ ম্যান জাস্ট কেপট মাম।

ইংলিশ মিডিয়ামের কৃপায় গোল্লা ইংরিজিতে মলয়ও একসময়েও কথা বলতে ভালবাসত। তারপর গাঁ গঞ্জে ঘুরে ঘুরে চাষিবাসীর সঙ্গে কথা বলে বলে সে রোগটা গেছে। সে পরিষ্কার বাংলায় বলল, দ্যাখো সইকুমার, পুণ্য কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারি পাশ, ইংরিজি বোঝে। একদিন তোমার না থেঁতো করে দেবে।

সরি সরি। নো হার্ড ফিলিং।— বলে সইকুমার সোজা হয়ে বসে। ফরসা টকটকে তার রং, ছিপছিপে চেহারার সুদর্শন তরুণ। খুবই স্মার্ট। হেসে বলল, নাউ টু বিজনেস। ব্যান্ডেলের সাইটটা কবে দেখতে যাবেন?

মলয় উদাস হয়ে বলে, তাড়া কী?

তাড়া আছে। ব্যান্ডেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেলটের মধ্যে। ওখানে জমি বেশিদিন পড়ে থাকবে না। ইন ফ্যাক্ট জায়গাটা আমার এত পছন্দ হয়েছে যে, আমি ফাইভ থাউস্যান্ড অ্যাডভান্সও করে এসেছি।

এই সব বদান্যতার পিছনে কী কূটকৌশল আছে তা নিজে ব্যাবসাদারের ছেলে হয়েও ঠিক বুঝতে পারছে না মলয়। দিনকাল যত এগোচ্ছে ততই মানুষ নানারকম নতুন প্যাঁচ বের করছে মাথা থেকে। সইকুমার নিজে টাকা ঢেলে তাকে প্রোডাকশনে নামাতে চায়, সেটা নিশ্চয়ই তাকে শিল্পপতি বানানোর জন্য নয়। পুরো ফিনান্সটা থাকবে ওর হাতে, মলয় হবে শিখণ্ডী— এরকমটাই ভেবেছে কি সইকুমার! নাকি মলয় নিজে থেকে প্রোডাকশনে নেমে একটা কিছু করে বসে সেই ভয়ে সইকুমার সেফটি ভালভ হিসেবে নিজে ওর ভিতরে ঢুকে বসতে চাইছে?

ভাবতে ভাবতে মলয় বলল, জায়গাটা তো আমার পছন্দ নাও হতে পারে।

কোনও ডিফিকালটি নেই। পছন্দ না হলে ছেড়ে দেব। ফাইভ থাউস্যান্ড ইজ নাথিং। না হয় তো জায়গাটা কিনে ফের বেচে দেওয়া যাবে। কাস্টমারের কমতি নেই। আজকাল লোক সব কিছু কেনে। জমি, বাড়ি, এনি সর্টস অব গুডস। বিজনেসম্যানরা বেচতে বেচতে হয়রান হয়ে যাচ্ছে।

মলয় হাসল না, কিন্তু মজা পেল। চারদিকে উদ্‌ভ্রান্ত ক্রেতাদের ভিড় দিনরাত সেও তো দেখছে। বাজার গরম। সে বলল, এখনও আমি কিছু ঠিক করিনি সইকুমার। এজেন্সির জন্যই মেলা খাটতে হচ্ছে। প্রোডাকশনে গেলে আরও খাটুনি।

পয়সার জন্য খাটতে তো হবেই। কিন্তু প্রোডাকশনে আমি আছি, আপনার চিন্তা কি? এক্সপেরিয়েন্সড লোক রেখে দেব। এ লিমিটেড কোম্পানি ওয়ান্স এস্টাব্লিশড গোজ অন ইটসেলফ।

তারপর কী হবে সইকুমার? লিমিটেড কোম্পানি হবে, নিজে থেকে চলবে, প্রোডাকশন হবে, মাল বিক্রি হবে, কিন্তু তারপর কী হবে?

সইকুমার হাসল। ঝকঝকে দাঁত। বলল, ইট গোজ বিগার অ্যান্ড বিগার।

তারপর?

মার্কেট পেয়ে যাবেন, প্রোডাকশন বাড়তে থাকবে, এর মধ্যে কোনও তারপর নেই। এজেন্সির চেয়ে প্রোডাকশনের ইজ্জত বেশি।

মলয় তা জানে। তবু মনশ্চক্ষে সে একটা দাবার ছক দেখতে পায়। প্রতিপক্ষ খুব ভাল মানুষের মতো আপাততুচ্ছ চাল দিচ্ছে। সেই চাল কতটা বিপজ্জনক তা তাকে ভেবে দেখতে হবে। সইকুমারকে সোজাসুজি না বলতেও সে পারছে না। কারণ, ইচ্ছে করলে ও নিজের টাকাতেই প্রোডাকশনে নামতে পারে। কিন্তু যেহেতু মলয়কে টানতে চাইছে সেইজন্যই মলয়ের লোভ এবং সন্দেহ।

নিঃশব্দে পুণ্য এসে সইকুমারকে চা দিয়ে গেল। সঙ্গে দুটো বিস্কুট।

সইকুমার তার ডান হাতের ঢিলা ব্যান্ডে বাঁধা মস্ত ঘড়িটার দিকে চাইল। বিদঘুটে ঘড়ি।

ডায়ালের মধ্যে ছোট ছোট আরও গোটা কয়েক ডায়াল। একগুচ্ছের টাকা গেছে। সইকুমার বলল, দি ওয়েদার ইজ হেল। আজ গাড়ি নিয়ে ফেঁসে যাব।

চা খেয়ে সইকুমার উঠল। বলল, তা হলে ব্যান্ডেল কবে যাবেন? গাড়িতে ম্যাকসিমাম ওয়ান আওয়ারস জার্নি। একটু আউটিংও হবে। হাউ অ্যাবাউট নেক্সট সানডে?

দেখছি। আমি তোমাকে ফোনে জানাব।

সইকুমার চলে গেলে মলয় ধৈর্যভরে টেলিফোন করে করে বিভিন্ন কোম্পানিতে নতুন মালের অর্ডার দিল। বাঁকুড়ার বহু এজেন্ট তার হাতে এসে গেছে। সঙ্গে করে সে প্রায় দু' লাখ টাকার অর্ডার এনেছে, অনেক কাজ। আবহাওয়া এরকম না হলে সে নিজে গিয়ে কয়েকটা সাপ্লায়ারের সঙ্গে দেখা করত। বাইরে ঝড় কমেছে বটে, কিন্তু চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে তুলে বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। দরজার কাচে জল জমে আছে। অন্ধকার এবং বদ্ধ বাতাসের ভ্যাপসা গরম আটকে আছে ঘরের মধ্যে। আগে বৃষ্টিকে সে বৃষ্টি হিসেবেই দেখত। আকাশ থেকে জল পড়ছে আজকাল রোদ বা বৃষ্টির সঙ্গে চাষবাস এবং তার নিজের ব্যাবসাকে জড়িয়ে সে হিসেব করে।

চিঠিপত্রের একটা ছোটখাটো ডাঁই জমেছে। মলয় আবছা আলোয় কয়েকটা খুলে দেখল। ভাল পড়া যায় না। তাই আর চেষ্টা করল না। বসে বসে রুকুর কথা ভাবতে লাগল। রুকুর এমন কী জরুরি দরকার?

ভাবতে ভাবতে পাঁচ মিনিটও যায়নি, রুকু এসে হাজির। ছাতাটা মুড়ে দরজায় ঠেসান দিয়ে রাখতেই সেটা থেকে অঝোর জল ঝরে পড়তে থাকে। রুকুর জামাকাপড়ও সপসপে ভেজা। ছাতায় বৃষ্টি তেমন আটকায়নি বোঝা যাচ্ছে। ঘরে ঢুকেই বলল, আজ আর বাড়ি ফেরা যাবে না দেখছি। রাস্তায় গোড়ালি সমান জল জমে গেছে। ট্র্যাফিক জ্যাম। ট্রাম বন্ধ।

মলয় স্থির চোখে চেয়ে দেখছিল রুকুকে। কোনও কথা বলল না। বৃষ্টিতে কলকাতার কী দুর্দশা হতে পারে তা তার চেয়ে বেশি আর কে জানে?

রুকু এক গাল হেসে বলল, সারা পথ ভিজতে ভিজতে এলাম, আর যেই তোর অফিসের দোরগোড়ায় এসেছি অমনি বৃষ্টি থামল।

থেমেছে!— বলে লাফিয়ে ওঠে মলয়। গিয়ে এক ঝটকায় বারান্দার দরজা খুলে ফেলে। হা হা করে ঠান্ডা বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে ঘরে ঢোকে। দু'-একটা জলকণাও সঙ্গে আসে বটে, তবে বৃষ্টি বাস্তবিকই থেমেছে।

মলয় ঘড়ি দেখে বলল, এখনও সময় আছে। দু'-একটা অফিসে ঢুঁ মারতে পারা যায়। তোর কথাটা চটপট সেরে ফেল।

রুকু দুঃখিত মুখ করে বলে, পুরনো বন্ধুকে এভাবে ঘাড়ধাক্কা দিতে হয়! দয়ী ঠিকই বলে, তুই আর আগের মতো নেই।

আগের মতোই চিরকাল যারা থেকে যায় তারা ইম্যাচুয়োরড। আমার কাজ-কারবার সবার আগে, তারপর সময় থাকলে ফ্রেন্ডশিপ। এখন গা তোল তো বাপ।

কোথায় যাবি?

চল তো।

রুকু ওঠে। অফিস থেকে বেরিয়ে বাঁ হাতে কিছু দূর হেঁটে মলয় তাকে একটা দেড় তলার রেস্তরাঁয় নিয়ে আসে। টেরিটিবাজারে এমন চমৎকার ছিমছাম রেস্তরাঁ আছে তা যারা না জানে তারা ভাবতেও পারবে না।

মলয় টেবিলে কনুই রেখে ঝুঁকে বসে বলল, বল এবার।

রুকু কোনও ভণিতা করার সময় পেল না। চিরকালই মলয় কাঠখোট্টা গোছের। সোজা কথা বলতে এবং শুনতে পছন্দ করে। রুকু তাই চোখ বুজে বলে ফেলল, তুই দয়ীর পিছনে লেগেছিস কেন?

তোকে কি দয়ী একথা বলেছে?

বলেছে এবং বলছে। প্রায় রোজই টেলিফোন করে।

কী বলছে?

বলছে তুই ওকে বিয়ে করতে চাস। ও রাজি নয়।

তুই কি ওর সেভিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছিস? আমি ওকে বিয়ে করতে চাইলে তুই ঠেকাতে পারবি?

রুকু সামান্য অবাক হয়ে বলে, এটা গুহামানবদের যুগ নয় মলয়। নেগোশিয়েশনের যুগ। গা-জোয়ারি করছিস কেন? চাইলে বিয়ে করবি। তাতে কী? কিন্তু দয়ীরও তো মতামত আছে!

এবার মলয় সামান্য হাসল। টেবিলের কাছে একটা বেয়ারা এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আলুর চপ, ঘুগনি আর চায়ের কথা বলে মলয় কিছুক্ষণ পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইল। তারপর হঠাৎ চোখ খুলে সোজা হয়ে রুকুর দিকে চেয়ে বলল, সারাদিন দয়ীর কথা আমি পাঁচ মিনিটও ভাবি না। আমি কস্মিনকালেও দয়ীর প্রেমে পড়িনি। তবু আমি মনে করি দয়ীর আমাকেই বিয়ে করা উচিত।

কেন?

কারণ দয়ী আমার সঙ্গে একাধিকবার শুয়েছে।

শুনে রুকু কিছুক্ষণ কথাটার নির্লজ্জতায় স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপর বলল, সেটাই কি যথেষ্ট কারণ?

সেটাই একমাত্র কারণ রুকু।

দয়ী তো এই কারণকে আমল দিচ্ছে না।

দেওয়া উচিত। শরীরটা তো ফ্যালনা নয় যে শরীরের সম্পর্কটা উড়িয়ে দিতে হবে।

রুকু করুণ একটু হেসে বলল, দয়ী তোকে শরীর হয়তো দিয়েছে, কিন্তু মন বলেও তো একটা কথা আছে!

মলয় মাথা নেড়ে বলে, মন বলে দয়ীর কিছু নেই। দয়ী কেন, দয়ীর জেনারেশনের কারও নেই। ওসব বস্তা-পচা শব্দ। ইউজলেস। আমি যদি দয়ীকে বিয়ে করি তবে সেটা ওরই সৌভাগ্য।

রুকু মোলায়েম স্বরে বলে, তুই হঠাৎ দয়ীর জন্য খেপে গেলি কেন বল তো!

খেপেছি কে বলল?

তুই নাকি ওকে প্রেমপত্র লিখিস? আর তাতে নাকি সব ভাবের কথা থাকে!

মলয় মৃদু হাসল। মাথা নেড়ে বলল, প্রেমপত্র লিখি বটে তবে কথাগুলো আমার নয়। চৌরঙ্গীর এক বুকস্টল থেকে 'ফেমাস লাভ লেটার্স' নামে একটা বই কিনেছিলাম। সেটা থেকে অনুবাদ করে দিই। প্রেমপত্র লেখার এলেম আমার কই? সময়ও পাই না।

রুকুর হাসি পেল না। গম্ভীর মুখে বলল, দয়ীকে ছেড়ে দে না মলয়। বেচারা এ বিয়ে চাইছে না। রিসেন্টলি ও নাকি একজন স্যুটেবল লোককে পেয়ে গেছে। সে বিয়ে করে দয়ীকে আমেরিকা নিয়ে যাবে। কিন্তু দয়ীর ভয়, তুই নাকি ঠিক সেই সময়ে বাগড়া দিবি। আফটার অল তুই যে ঘ্যাম নকশাল ছিলি সেটা ও ভুলতে পারছে না।

নকশাল ইজ এ ডেড পাস্ট। ওসব কথা ওঠে না। নকশাল ছাড়া কি ভয়ংকর লোক নেই? আমি নকশাল না হলেও ওর সুবিধে হত না।

তুই কী করতে চাস?

কিছু করব তো বটেই। তবে সেটা যে কী তা এখনও ঠিক করিনি। দয়ীকে কিডন্যাপ করলে কেমন হয়?

ইয়ার্কি মারিস না। কিডন্যাপ করলে পুলিশ-কেস।

বেয়ারা চপ আর ঘুগনি রেখে গেল। দারুণ ভাল গন্ধ ছাড়ছে। রুকু আর মলয় খেতে লাগল। খেতে খেতেই মলয় মুখ তুলে বলল, আমার চেহারাটা কেমন রে?

রুকু এক ঝলক চেয়ে দেখে গম্ভীর মুখেই বলে, চোঁয়াড়ের মতো। ইয়েট খানিকটা অ্যাপিল আছে।

অ্যাপিলটা কীসের? সেক্স?

ননা!

তবে?

খুব শক্তপোক্ত চেহারা। বোধহয় তোর মতো মানুষের ওপর মেয়েরা নির্ভর করতে পারে।

তবে দয়ী নির্ভর করতে চাইছে না কেন?

দয়ীও যে খুব শক্ত মেয়ে। ও চায় এমন পুরুষ যে ওর ওপরই নির্ভর করে।

ভ্রু কুঁচকে মলয় বলে, তা হলে আমাদের ম্যাচ করে না বলছিস?

বোধ হয় না।

তা হলে আমেরিকা থেকে দয়ীর ভাল পাত্তর এসেছে!

তাই তো বলছে।

খামোখা একটা গা-জ্বালানো হাসি হাসছিল মলয়। বলল, দয়ী আমাকে চায় না কেন জানিস?

আমাকে খুব একটা ভেঙে কিছু বলেনি। তবে বলছিল বন্ধুকে কি বিয়ে করা যায়!

সেটা কোনও কথা নয়। আমি একটা জিনিস মানি। ও যখন আমাকে শরীরটা দিয়েছে তখন বাকিটাও দেওয়া উচিত।

রুকু সহজে বিরক্ত হয় না। এবার হল। বলল, শরীরের কথা বার বার তুলছিস কেন? দয়ী হয়তো তোকে ছাড়াও আর কাউকে শরীর দিয়েছে। তা বলে সবাইকে বিয়ে করতে হবে নাকি?

খুব চোখা নজরে রুকুকে দেখল মলয়। তারপর বলল, তোর ধৈর্য কমে যাচ্ছে রুকু। আগের মতো তোর সহনশীলতা নেই।

রুকু লজ্জা পেল। তবে স্বীকার করল না।

বলল, তুই অত শরীর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?

মলয় স্থির চোখে চেয়ে বলে, তোর একটা সুবিধে আছে রুকু। তোর শরীর লাগে না। তুই বোধহয় এখনও সেই কবেকার গুলি খেয়ে মরা তাপসীকে ভেবে মাসটারবেট করে যাচ্ছিস।

এই অপমানে রুকুর মুখের সুস্বাদু ঘুগনি ছাইয়ের মতো বিস্বাদ হয়ে গেল। চামচটা নামিয়ে রেখে কিছু সময় মাথা নিচু করে টেবিলের দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর প্রবল মানসিক চেষ্টায় মুখ তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

মলয় সামান্য তেরছা হাসি হেসে বলল, কথাটা উড়িয়ে দিস না। মাসটারবেট যারা করে তাদের চেহারায় লাবণ্য থাকে না, চোখ গর্তে ঢুকে যায়, এবং ক্রমে ক্রমে তাদের চিন্তাশক্তি, নার্ভের জোর আর মানসিক ভারসাম্য কমে আসে। তোর মধ্যে সব ক'টা লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি।

রুকু সাদা মুখে মড়ার মতো হাসে একটু। কথাটা অপমানকরই শুধু নয়, সত্যও। তাই তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায় উপর্যুপরি গুলি খেয়ে। কোনও কথাই আসে না মুখে।

মলয় তেমনি শান্ত, নিরুদ্বেগ, নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বলে, আমি তোকে থরোলি জানি রুকু। তোর বোর্ডিং-এ এক বিছানায় আমি অনেক রাত কাটিয়েছি। তোকে খামোকা অপমান করার জন্য তাপসীর কথা তুলিনি। আমি জানি তুই এখনও সেই মরা মেয়েটাকে নিয়ে ঘুমোতে যাস। আমি ষোলো বছর বয়স থেকে রক্তমাংসের তরতাজা মেয়েমানুষ ঘাঁটছি। আমার কোনও সেন্টিমেন্ট নেই। তবু আমি দয়ীকে বিয়ে করার কথা কেন ভাবছি জানিস?

রুকু নিজের ভিতরের শূন্যতায় ডুবে বসেছিল। একটা কথাও তার কানে ঢুকছিল না। তবু মলয় কিছু জিজ্ঞেস করছে বুঝতে পেরে মুখ তুলল।

মলয় বলে, বেশ কয়েক বছর আগে দয়ী আমার দারুণ অ্যাডমায়ারার ছিল। তখন আমি বিপ্লবী ছাত্রনেতা। দয়ী প্রায়ই বলত, তোমার মতো ভয়ংকর পুরুষকেই আমি সবচেয়ে ভালবাসি। কিছু মনে করিস না, দয়ীর হয়তো খানিকটা ফাদার অবসেশনও ছিল। ওর বাবা ছিল ফোর্থ গ্রেড গুন্ডা। যাই হোক, সে সময়ে একদিন দয়ী খুব সাহস করে আমাকে বলল, চলো বাইরে কোথাও ক'দিন বেরিয়ে আসি। আমি ইঙ্গিতটা বুঝলাম। দয়ী শরীরের সম্পর্ক চাইছে! আনইউজুয়াল কিছু নয়। ঝাড়গ্রাম ছাড়িয়ে গিধনি নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে আমার এক বন্ধু রেলে চাকরি করে। প্রায়ই যেতাম। রেল কোয়ার্টারের দু'-একটা সব সময়েই খালি পড়ে থাকে। কোনও অসুবিধে ছিল না, একদিন দয়ীকে নিয়ে গিয়ে সেখানে উঠলাম। কিন্তু প্রথম দিনই শালবনে বেড়াতে গিয়ে একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গেল। কয়েকটা ছেলে-ছোকরা আমাদের পিছনে লেগেছিল একটু। সেটাও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কলকাতায় এরকম তো কত হচ্ছে। আমি মাইন্ড করিনি। ওরা তেমন খারাপ কিছু বলেওনি। একজন বলে উঠেছিল, দ্যাখ দ্যাখ, কলকাতার মাল দ্যাখ। শালা গিধনিতে মজা লুটতে এসেছে। কিন্তু দয়ী ব্যাপারটা উড়িয়ে না দিয়ে ভীষণ ফুঁসে উঠল। ফিরে দাঁড়িয়ে ইডিয়েট, গ্রাম্য, কোনওদিন মহিলা দ্যাখেনি, ব্লান্ট হেডেড ইত্যাদি বলে গালাগাল দিতে লাগল। ছেলেগুলোও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। ওটা ওদেরই তো জায়গা। তারাও রুখে উঠে বলতে লাগল, কেরদানি বের করে দেব, গিধনিতে মজা করতে আর আসতে হবে না। কলকাতার ফুটানি কলকাতায় গিয়ে দেখাবেন। আমি মাঝখানে পড়ে থামানোর চেষ্টা করি, কিন্তু দয়ী ছাড়বার পাত্রী নয়। যে ছোকরাটা দু' কদম এগিয়ে এসে বেশি তেজ দেখাচ্ছিল, দয়ী ছুটে গিয়ে পায়ের স্লিপার খুলে তার গালে ঠাস করে বসিয়ে দিল। তারপর যা হয়। ছোকরারা আমাদের ঘিরে ফেলল চোখের পলকে। কিল ঘুসি লাথি চলতে লাগল সমানে। আমি এসব ছোটখাটো ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করি না। তবু দয়ীর সম্মান রাখতে অনিচ্ছের সঙ্গেও লড়তে হল। ছেলেগুলো কিছুক্ষণ খামচাখামচি করে হাঁফাতে থাকে। তারপর শাসায়। আমি তখন তাদের গায়ে-টায়ে হাত বুলিয়ে ঠান্ডা করি। ব্যাপারটা মিটেও যায়। কিন্তু সেই থেকে দয়ী বেঁকে বসল। সেই রাত্রেই আমাদের প্রথম একসঙ্গে শোওয়ার কথা। কিন্তু দয়ী কিছুতেই রাজি নয়। কেবল কাঁদে আর বলে, ওই বদমাশরা আমার শরীরের লজ্জার জায়গায় হাত দিয়েছে, মেরেছে, আর তুমি ওদের তোয়াজ করলে! তুমি কি পুরুষ মানুষ? আমি এতদিন তোমাকে নিয়ে অন্য স্বপ্ন দেখতুম। সারা রাত চোখের জল আর খোঁচানো কথা দিয়ে দয়ী আমাকে যথেষ্ট তাতিয়ে তুলল। এ কথা সত্যি যে, আমি পলিটকসের জন্য কয়েকটা খুন করেছি। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও কারণে মানুষকে মেরে ফেলার কথা আমি ভাবতেও পারি না। কিন্তু সেই রাতে দয়ী শরীর দেয়নি বলে কামে ব্যর্থ হয়ে আমি খেপে উঠেছিলাম। দয়ী আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, ছোকরাদের পালের গোদাকে ফিনিশ করব। পরদিন একটু খোঁজ নিতেই ছোকরার পাত্তা মিলল। পশ্চিমধারে মস্ত একটা মাঠের গায়ে নির্জন জায়গায় তার বাড়ি। সন্ধের মুখে একটু গা ঢাকা দিয়ে দয়ী আর আমি গিয়ে বাড়ির কাছাকাছি ঝোপ জঙ্গলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আর দয়ীর তখন কী উত্তেজনা! বার বার আমার হাত চেপে ধরছে, এমনকী চুমুও খাচ্ছে। কখনও পাগলের মতো হাসছে, কখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটু পরেই একটা খুন করতে হবে ভেবে আমি দয়ীর দিকে মনোযোগ দিতে পারছি না। তবু আমার একটা চোখ সারাক্ষণ দয়ীকে লক্ষ করছিল। আমার মন বলছিল, এ খুনটা কেবলমাত্র দয়ীর শরীরের জন্যই আমাকে করতে হচ্ছে না তো! যদি তাই হয় তবে দয়ীর শরীরের জন্য আমাকে অনেকটাই মূল্য দিতে হল। ভাববার বেশি সময় ছিল না। আচমকা দেখলাম, নির্জন মাঠের পথ ধরে একা হেঁটে আসছে একটা ছেলে। খুবই আবছা দেখাচ্ছিল তাকে। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়ালাম। এক হাতে রিভলভার,

সরিতের একটু লজ্জা করছিল। ভিতরে বেলুন চোপসানোর মতো একটা ক্লান্তিকর হতাশা। এদিকটা সে কখনও ভেবে দ্যাখেনি। চিঠিটা পেয়ে একটা মস্ত যুদ্ধাস্ত্র পেয়ে যাওয়ার আনন্দে সরিৎ সেটা নিয়ে সোজা এক ফোটোগ্রাফারের দোকানে গিয়ে ছ'খানা ফোটোস্টাট কপি করায়। চিঠিখানা সযত্নে রেখে দেয় স্টিলের আলমারিতে। ইচ্ছে ছিল দয়ী এবং শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে এগুলোকে সে কাজে লাগাবে।

সরিৎ কোনও জবাব দিল না দেখে মৃন্ময়ী বলে, তুমিও কাজটা পুরুষের মতো করোনি।

সরিৎ ধমকে উঠল না বটে কিন্তু বিষ মেশানো শ্লেষের হাসি হেসে বলল, তাই নাকি? তোমাদের রক্তে যে দোষ রয়েছে সেটা বললেই বুঝি পুরুষত্বের অপমান হবে?

মৃন্ময়ী আর কথা বলল না, উঠে চলে গেল।

বাইরে অন্ধকার ঘনাল। ঘরটা হয়ে উঠল আরও উজ্জ্বল। সরিৎ বিনয়ের রেখে-যাওয়া প্যাকেট থেকে অনভ্যাসের হাতে আর একটা সিগারেট বের করে ধরাল। ছাদে ওরা কী করছে?— ভ্রু কুঁচকে ভাবতে থাকে সরিৎ।

॥ মলয় ॥

যেখানেই কিম্ভূত মোটর-সাইকেলটা দাঁড় করায় মলয় সেইখানেই লোকের ভিড় জমে যায়। এত বিশাল চেহারা আর জটিল যন্ত্রপাতিওলা মোটর-সাইকেল কলকাতার লোক খুব বেশি দেখেনি।

হরিয়ানার এক সম্পন্ন চাষি-ঘরের ছেলে এই যন্তরটা কিনে এনেছিল আমেরিকা থেকে। তাদের জমিতে একর প্রতি যে গমের ফলন হয় তা নাকি বিশ্বরেকর্ড। সেই সূত্রেই সে সারা পৃথিবী চষে বেড়ায় বছরভোর। অফিসের কাজে দিল্লিতে গিয়ে ছোকরার সঙ্গে এক হোটেলে ভাব জমে গেল মলয়ের। কথায় কথায় ছোকরা জানাল, সে আর কয়েক দিনের মধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চাষিদের গমের চাষ শেখাতে যাচ্ছে। অনেকদিনের প্রোগ্রাম। কাজেই মোটর-সাইকেলটা তার কোনও কাজে লাগবে না এখন। তার ইচ্ছে আরও আধুনিক, আরও বেশি শক্তির একটা যন্ত্র কেনা। শুনে মলয় তক্ষুনি রফা করে ফেলল। ট্র্যাভেলারস চেক ভাঙিয়ে কিনে ফেলল বিকট যানটা। আনকোরা নতুন জিনিস নয়, তা ছাড়া হরিয়ানার চাষি ছোকরা জোরে চালাতে গিয়ে বারকয়েক অ্যাকসিডেন্ট করায় মোটর-সাইকেলটা তুবড়ে-তাবড়েও গেছে অনেকটা। তবু এই জাহাজের মতো বিশাল যন্ত্রযানটির এখনও যা আছে তা তাক ধরিয়ে দেওয়ার মতো।

অফিসটা মলয়ের নিজের। তার বাবার মস্ত একটা রঙের কারবার আছে। অঢেল পয়সা। মলয়দের সাত ভাইয়ের মধ্যে চার ভাই বাবার ব্যাবসায় খাটছে। বাকি তিন ভাইয়ের মধ্যে একজন রেলের ডাক্তার, মলয় হচ্ছে ছ' নম্বর। পরের ভাই সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র। বাবার ব্যাবসাকে মলয় বরাবর বলে, এ রং বিজনেস। কলেজে পড়ার সময় নকশাল রাজনীতিতে মেতে যাওয়ার ফলে মলয়ের লেখাপড়া খুব বেশি দূর এগোয়নি। বি এসসির শেষ বছরে সে পড়াশুনো ছেড়ে দেয়। পড়ে পরীক্ষা দিলে একটা দারুণ রেজাল্ট করতে পারত। পড়াশুনোর মতো তাদের আন্দোলনটাও হঠাৎ মাঝপথে থেমে যায়। তখন মলয়ের হাতে অনেক রক্তের দাগ এবং ভিতরে অতৃপ্ত ফোঁসফোঁসানি। পিছনে পুলিশ এবং প্রতিপক্ষের নজর ঘুরে বেড়ায় সব সময়। তাই কিছুদিন একদম একা চুপচাপ নিজেদের খিদিরপুরের বাড়ির চিলেকোঠায় অন্তরীণ হয়ে রইল সে। তারপর বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে সার এবং কীটনাশকের ব্যাবসা খুলে বসল।

ব্যাবসার যে এ রকম রবরবা হবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। প্রথমে দুটো-তিনটে অনামী কোম্পানির ডিলারশিপ নিয়ে বসেছিল, পরে নামীদামি বহু কোম্পানি তাকে এজেন্সি গছানোর জন্য

ঝুলোঝুলি শুরু করে। বড় বড় কোম্পানি এখন এজেন্ট আর ডিলারদের টি ভি সেট থেকে শুরু করে দামি দামি গিফট আর প্রাইজ দিচ্ছে। প্রচুর কমিশন। টাকায় গড়াগড়ি খাচ্ছে মলয়। আজকাল প্রায়ই তাকে দূর-দূরান্তে গ্রামে-গঞ্জে চলে যেতে হয়। কেবল কলকাতায় বসে বসে মাল বেচে যাওয়ার পাত্র সে নয়। মলয় জানে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে চাষিদের সঠিক প্রয়োজনগুলো বোঝা যায়, বোঝা যায় কোন সার বা কোন কীটনাশক কেমন কাজ দিচ্ছে। কোনটার চাহিদা বেশি বা কোনটার চাহিদা বাড়ানো উচিত। এই সব মার্কেট রিসার্চ করা থাকলে লক্ষপতি থেকে কোটিপতি হওয়া কঠিন নয়। তা ছাড়া ব্যক্তিগত জানাশুনো আর বন্ধুত্ব গড়ে উঠলে অঢেল সুবিধে। তার ইচ্ছে আছে কয়েকটা কীটনাশক সে নিজেই তৈরি করবে, বানাবে একটা ছোটখাটো ল্যাবরেটরি। প্রোডাকশন হাতে থাকলে বাজারটা হাতের মুঠোয় চলে আসে। কিন্তু এই প্রোডাকশনে নামার কথাটা সে মনে মনে ভাবতে না ভাবতেই একজন ছোকরা মারোয়াড়ি ঘোরাফেরা শুরু করেছে। সে টাকা খাটাতে চায়। মলয় ল্যাবরেটরি বানালে সে টাকা দেবে। তা ছাড়া, ডিলারশিপেও সে টাকা ঢালতে ইচ্ছুক। চাই কি গোটা ব্যাবসাটাই মোটা টাকায় কিনে নিতে পারে। মলয় এই প্রস্তাবগুলো নিয়ে আজকাল খুব চিন্তিত। গোটা কলকাতাটাই এখন মারোয়াড়ি আর বেশ কিছু অবাঙালি ব্যাবসাদারদের হাতে। বাঙালির যে ব্যাবসাই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সেটাই প্রায় অবিশ্বাস্য দাম হেঁকে কিনে নেয় কেউ না কেউ। কিনে যে ব্যাবসাটাকে হাতে রাখে সব সময় তাও নয়। অনেক সময়েই বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ তারা অনভিপ্রেত প্রতিযোগিতাকে গলা টিপে নিকেশ করে। মলয় ছেলেটাকে সাফ জবাব দেয়নি বটে, কিন্তু তার মনটা খাট্টা হয়ে আছে। আগে মারোয়াড়িরা মদ-মাংস খেত না, আজকালকার নব্য মারোয়াড়িরা সব খায়। এই ছোকরা একদিন মলয়কে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের রেস্তরাঁয় অনেক টাকা ওড়াল, প্রচণ্ড মাতাল হয়ে গেল এবং তারপর মলয়কে সোজাসুজি বলল, তোমরা তো বুদ্ধুর জাত। বাঙালি বলতেই আমরা বুঝি বোকা লোক। যে টাকা কামাতে পারে না সে আবার চালাক কীসের?

হক কথা। মলয়ের রক্ত গরম হলেও কথাটা সে মনে রেখেছে। এখন তার ধ্যান জ্ঞান একটাই— টাকা কামাতে হবে। তাদের পরিবারের প্রায় সকলেরই ব্যাবসার ধাত। মলয় ব্যাবসাটা ভালই বোঝে। তাই খুব অল্প সময়ে কোনও রকম লোকসান না খেয়ে সে দু' হাতে টাকা কামাই করেছে এবং করছে। চমৎকার গুড উইল দাঁড়িয়ে গেছে বাজারে। স্থায়ী ক্রেতার সংখ্যা এখন অবিশ্বাস্য রকমের বেশি। আগে চাষের মরশুমেই যা কিছু ব্যাবসা হত, অন্য সময়টা মন্দা। আজকাল আধুনিক কৃষির কল্যাণে সারা বছরই প্রায় কাজ হচ্ছে। মলয়ের তাই মন্দা সময় বলে কিছু নেই।

কিন্তু সব সময়েই এই একঘেয়ে ব্যাবসা এবং টাকা রোজগার করে যাওয়া মলয়ের কাছে প্রচণ্ড বিরক্তিকর। তার ভিতরে একটা রোখা চোখা তেজি অবাধ্য মলয় রয়েছে। সেই মলয় সত্তরের দশককে মুক্তির দশক করার কাজে নেমে এক নদী রক্ত ঝরিয়েছিল। এই টাকা আয়কারী মলয়ের সঙ্গে তার আজও খটাখটি। মলয় তাই সব সময়েই কেমন রাগ নিয়ে থাকে, অল্পেই ফুঁসে ওঠে। সে মারকুট্টা, বদমেজাজি এবং অনেকটাই বেপরোয়া। বন্ধুরা তাকে ভয় খায়। খদ্দেররা তাকে সমঝে চলে।

এই খর ধুন্ধুমার গ্রীষ্মকালে বাঁকুড়ার সোনামুখীতে সাত সাতটা দিন কাটিয়ে এল মলয়। গায়ের চামড়া এ ক'দিনেই রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে, কিছু রোগাও হয়ে গেছে সে। বড় চুল রুখু হয়ে কাঁধ ছাড়িয়ে নেমেছে। সকালে স্নানের সময় কলঘরের আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখল সে। কিন্তু চেহারা নিয়ে তার মাথা ঘামানোর কিছু নেই। বরাবরই টান টান ধারালো ইস্পাতের মতো চেহারা তার। মুখখানা হয়তো নিটোল নয়, কিন্তু হনুর বড় হাড়, ভাঙা গাল এবং একটু বসা সত্ত্বেও সে অতীব আকর্ষণীয় চেহারার মানুষ। লোকে তাকে দেখলেই বোঝে, এ লোকটা জোর খাটাতে জানে। খুবই আত্মবিশ্বাসময় তার চলাফেরা, হাবভাব। কথাবার্তায় সে অহংকার প্রকাশ করে না, কিন্তু তার মর্যাদাবোধ যে টনটনে এটা সবাই বুঝে নেয়। কথা খুব কমই বলে, ঠাট্টা বা রসিকতা বেশি পছন্দ নয়।

দয়ী হঠাৎ হাসতে থাকে। বলে, তোমাকে বোকা পেয়ে গুল ঝেড়েছে মলয়। গুলি করবে কী? ওর কাছে তো আর্মস ছিল না। তা ছাড়া আমরা সেখানে নতুন জায়গায় গেছি, কিছুই তেমন জানি না। মার্ডার কি অত সোজা রুকু? পুরো গুল।

সত্যি বলছ?

তুমি কী করে ভাবলে আমাকে খুশি করতে মলয় খুন করতে যাবে? মলয় কি অত বোকা? আমি ছাড়াও ওর তখন ডজনখানেক বান্ধবী ছিল। কাউকেই কোনওদিন খুশি করার দায়িত্ব নেয়নি মলয়। বরং আমরাই ওকে খুশি করতে চাইতাম। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, গিধনিতে মলয় কাউকে খুন করেনি।

রুকু লক্ষ করে, যার টেবিলে ফোন সেই পালবাবু বড় সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। মস্ত হলঘরটা পার হতে যেটুকু দেরি। সে তড়িঘড়ি চাপা-স্বরে বলে, ফোনে আর বেশিক্ষণ কথা বলা যাবে না দয়ী, অসুবিধে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা ছিল।

পরে হবে দয়ী।

রুকু ফোন রেখে নিজের টেবিলে ফিরে আসে এবং চুপ করে বসে থাকে। সে কতদূর নির্বোধ তা ভেবে থই পাচ্ছিল না। মলয় যে তাকে মাস্টারবেশনের কথা তুলে লজ্জা দিয়েছিল তা আসলে একটা অতিশয় কূটবুদ্ধির চালাকি। কথাটা তুললে রুকু যে সংকুচিত হয়ে নিজের ভিতরে লজ্জায় গুটিয়ে যাবে তা খুব ভালভাবে জেনেই মলয় চালটা দিয়েছে। আর তারপর এমনভাবে গিধনির খুনের বানানো গল্পটা ঝেড়েছে যা রুকু সেই মানসিক অবস্থায় বিশ্লেষণ করে দেখেনি। ইংরিজিতে যাকে বলে কট ইন দি রং ফুট। কিন্তু খুনের ঘটনাটা বলার পিছনে মলয়ের আর কোনও কূটবুদ্ধি কাজ করছে তা ভেবে পায় না রুকু। তাই মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে। মলয় কাল বলেছিল দয়ীদের জেনারেশন কতদূর নষ্ট হয়ে গেছে তা সে জানতে চায়। কথাটা ভেবে আজ হাসি পাচ্ছে রুকুর। মলয় কোনওদিনই মেয়েদের নষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়ে মাথা ঘামায়নি। বরং একসময়ে এ নিয়ে রুকুই লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিত। তার ছিল মফস্সলের গেঁয়ো মানসিকতা। মেয়েদের শরীরের পবিত্রতা ছিল তার অতিশয় শ্রদ্ধার জিনিস। মলয় কি সেটারই পালটি দিল কাল? ওটা কি নিছক রুকুকে ঠাট্টা করার জন্যই বলা?

বেলা পাঁচটা পর্যন্ত রহস্যটা রহস্যই থেকে গেল।

অফিস থেকে বেরোবার মুখে জানলা দিয়ে আজও বাইরে বর্ষার মেঘ দেখতে পায় রুকু। আজও বৃষ্টি হবে। বড় বেশি দেরিও নেই। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, তাতে বৃষ্টির গন্ধ মাখা। অফিসের পর আজকাল রুকুর কোথাও যাওয়ার নেই। তার বন্ধুরা বেশিরভাগই বড়সড় চাকরি করে। কারও হাতে ফালতু সময় নেই। রুকু নিজেও আড্ডা দেওয়ার সময় পায় না। চাকরি ছাড়াও টিউশানি আছে। তবু আজ তার একটু হালকা সময় কাটানোর বড় ইচ্ছে হচ্ছিল। দীর্ঘদিন বিরামহীন কাজ ও একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তি মাথাটাকে ভার করে রেখেছে। আর সে কিছুতেই মলয়ের অপমানটাকে ভুলতে পারছে না। বারবার একটা আয়না কে যেন তার মুখের সামনে তুলে ধরছে, আর সে নিজের কোটরগত চোখ, ভাঙা চোয়াল, লাবণ্যহীন শুষ্ক মুখশ্রী দেখছে। তার বোধহয় কিছু ভিটামিন-টিন খাওয়ার দরকার। আর দরকার বিশ্রী আত্মমৈথুনের পুরনো অভ্যাস থেকে মুক্তি। সংসারের দায়িত্বের কথা ভেবে এতকাল সে বিয়ের কথায় কান পাতেনি। আজ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে ভাবছিল, বিয়ে করলে কেমন হবে? ভাবছিল, মা সন্তোষপুরে যে উকিলের মেয়েটির কথা প্রায়ই বলে, তাকে একবার গিয়ে দেখে আসবে। পছন্দ হলে এবার বিয়ের সম্মতি দিয়ে দেবে। ভাল হোক, মন্দ হোক, জীবনের একটা খাত বদল এবার দরকার।

অফিসের বড় দরজার মুখেই সে থমকে গিয়ে এক গাল হাসল, বলল, তুমি?

মাস দুই দয়ীর সঙ্গে দেখা হয়নি। ফোনে কথা হয়েছে মাত্র। দয়ী এই দুই মাসে কিছু রোগা হয়েছে। নাকি এই রুগ্নতাকেই স্লিমনেস বলে আজকাল? খুবই সাধারণ ম্যাটম্যাটে রঙের একটা বাদামি তাঁতের শাড়ি পরনে, সাদা ব্লাউজ। মুখে কোনওদিনই তেমন প্রসাধন মাখে না দয়ী। আজ প্রসাধনহীন মুখখানা বেশ ঘামতেলে মাখা। একটু হেসে বলল, কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি তোমাকে চমকে দেব বলে।

চমকে একটু দিয়েছ ঠিকই। জানিয়ে রাখলে অফিস থেকে কিছু আগে বেরিয়ে আসতাম।

দয়ী মুখ টিপে একটু হেসে বলল, কিংবা জানালে হয়তো আমাকে এড়ানোর জন্য অফিস থেকে আগে ভাগেই কেটে পড়তে। তুমি যা ভিতু!

না, না। লজ্জা!— বলে একটু হাসে রুকু।

ফুটপাথ ঘেঁষে দয়ীর ফিয়াট দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে দয়ী বলল, ওঠো।

চুপি চুপি একটু আরামের শ্বাস ছাড়ে রুকু। আজকের দিনটা অন্তত বাসের ভিড়ে চিংড়ি লাদাই হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে না। দয়ী লিফট দেবে।

পাশে ড্রাইভিং সিটে বসে দয়ী গাড়ি চালু করে বলে, তোমাকে আমার পার্সোনাল প্রবলেমের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে ভাল কাজ করিনি রুকু। কাল মলয় তোমাকে কেন অপমান করল খুব জানতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য খুব সেনসিটিভ ব্যাপার হলে বোলো না।

রুকুর মুখ চোখ লজ্জায় নরম হয়ে যায়। সে চোখ নিচু করে কোলের ওপর নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে থাকে।

দয়ী ময়দানের দিকে গাড়ি চালায়। আড়চোখে একবার রুকুর মুখের ভাব লক্ষ করে বলে, তোমাকে মলয় কতটুকু অপমান করেছে জানি না। কিন্তু আমাকে ওর কাছে বহুবার হাজারো অপমান সইতে হয়েছে। আমার বাবার পাস্ট হিস্টরি খুব ভাল নয়, জানো তো! কথায় কথায় ও আমার বাবা তুলে যাচ্ছেতাই সব কথা বলে। তোমাকে তো আমার লুকোনোর কিছু নেই রুকু। আমি সতীত্ব-টতীত্ব মানি না। স্কুল লাইফ থেকেই ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে ফ্রিলি মিশি। সেই জন্যও মলয়ের রাগ। ও যখন নিজে আমার সঙ্গে লাইফ এনজয় করেছে তখনও আমাকে প্রস-ট্রস বলে গালাগাল করেছে। মাইথনে গিয়ে একবার আমাকে মলয় মেরেছিল। তখন ওকে ভালবাসতাম বলে সব সহ্য করেছি। ইন ফ্যাক্ট তখন ও আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া মাত্রই আমি রাজি হয়ে যেতাম। কিন্তু আফটার অল দিজ ইয়ারস আমি এখন অনেক ম্যাচিওরড। আমি জানি মলয় কেমন লোক।— বলে চুপ করে থাকে দয়ী।

মলয় কেমন লোক দয়ী?— রুকু জিজ্ঞেস করে।

রেস্টলেস, ক্রুয়েল অ্যান্ড রেকলেস। খুব শিগগিরই একদিন ওর পাগলামি দেখা দেবে। পলিটিকস ছেড়ে দিয়েছে বটে কিন্তু সেই সব আক্রোশ আর রাগ এখনও জমে আছে ওর ভিতর। ও আমাকে বিয়ে করতে চায় কেন জানো?

বোধহয় তোমাকে নিয়ে ওর কিছু এক্সপেরিমেন্ট এখনও বাকি।

ঠিক তাই। অর্থাৎ প্রত্যেক দিন ওর বিষের থলিতে যত বিষ জমা হয়ে টনটন করে তা উজাড় করার জন্য ঠিক আমার মতো একজনকে ওর দরকার। ও আমার বাবার ইতিহাস জানে, আমার সমস্ত দুর্বলতাকে জানে। ও জানে কতভাবে আমাকে নির্যাতন আর অপমান করা যায়।

রুকু একটু হাসল। বলল, কত করুণ ছবি আঁকছ দয়ী! কিন্তু আমি জানি মেয়েরা মোটেই অত অসহায় নয়। খুব সাদামাটা নিরীহ মেয়েও কিন্তু আর কিছু না পারুক স্বামীকে শাসনে রাখতে জানে। সে তুলনায় তুমি তো অনেক বেশি অ্যাডভান্সড মেয়ে।

দয়ী রঞ্জি স্টেডিয়াম পেরিয়ে গঙ্গার ধারে চলে এল। গাড়িটা ফুরফুরে হাওয়ায় দাঁড় করিয়ে বলল, মিথ্যে বলোনি। কিন্তু মলয় অ্যাভারেজ পুরুষদের মতো তো নয়। ও অনেক বেশি হিংস্র,

অনেক বেশি ঠান্ডা রক্তের মানুষ। ও কত অকপটে হাসিমুখে আমাকে বেশ্যা বলে গাল দেয় তা তুমি জানো না। মাইথনে সেবার আমাদের প্রচণ্ড ঝগড়া হলে আমি রেগে গিয়ে ওকে বলেছিলাম তুমি আসলে হোমোসেকসুয়াল, তাই মেয়েদের নিয়ে তোমার সুখ হয় না। তাইতে ভীষণ রেগে গিয়ে ও আমাকে প্রচণ্ড মেরেছিল। পরে ভেবে দেখেছি, কথাটা আমি রাগের মাথায় হয়তো খুব মিথ্যে বলিনি। মে বি হি ইজ হোমোসেকসুয়াল। নইলে অত খেপে উঠবে কেন কথাটা শুনে?

রুকুর ভিতরে টিকটিক করে কিছু নড়ে উঠল। কাল মলয় তাকে খুব লজ্জা দিয়েছিল, আজ মলয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মতো একটা অস্ত্র পেয়ে গেছে; কিন্তু অস্ত্রটা কোনওদিনই ব্যবহার করতে পারবে না রুকু। সে কাউকে সামনা সামনি অপমান করতে পেরে ওঠে না। শুধু চিন্তিতভাবে বসে রইল সে। দয়ী আর মলয়ের অপবিত্র কাম ও ঘৃণার সম্পর্কের কথা ভাবতে লাগল।

দয়ী তাকে কনুইয়ের একটা ছোট্ট ঠেলা দিয়ে বলল, কোনও কথা বলছ না কেন রুকু?

রুকু ম্লান হেসে বলে, কী বলব বলো তো! আমি অনেকটাই গেঁয়ো মানুষ। তোমাদের এই আধুনিক মানসিকতা কিছু বুঝতে পারি না। কেনই বা তুমি মলয়কে শরীর দিতে যাও, আর কেনই বা মলয় তোমাকে ঘেন্না করে, এসব খুব রহস্যময় আমার কাছে।

দয়ী একটু ধৈর্য হারিয়ে বলে, অত বোকা সেজো না রুকু। শরীরের ব্যাপারে কোনও রহস্য নেই। শরীর তো কোনও দর্শন নয়, কোনও ধর্মটর্মও নয়, তার কোনও গভীরতা নেই। নিতান্তই পেটের খিদের মতো একটা মোটা দাগের ব্যাপার। তার আবার রহস্যই কী, শুচিবাইয়েরই বা কী?

রুকু মাথা নেড়ে বলে, তুমি হয়তো জানো না দয়ী, তোমার প্রবলেমটাও শরীর নিয়েই। শরীরের গভীরতা না থাক, হ্যাজার্ডস আছে। মলয় আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল, শরীরের জন্যই ও তোমাকে ছাড়তে নারাজ।

মিথ্যে কথা রুকু। যে ডজন ডজন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে তার কখনও একটা বিশেষ মেয়ের জন্য পাগল হওয়ার কারণ নেই। সে যেমন তোমাকে গিধনির খুনের গল্প বানিয়ে বলেছে এটাও তেমনি আর একটা বানানো কথা।

রুকু বিষণ্ণভাবে বলে, কিন্তু আমার তো আর কিছু করার নেই দয়ী। তোমার জন্য মলয়কে খুন করতে তো আমি পেরে উঠব না।

দয়ী গম্ভীর মুখ করে বলল, খুনের প্রশ্ন ওঠে না।

তবে তুমি ওকে নিয়ে অত ভাবছ কেন দয়ী? ও ভাংচি দেবে ভয়ে?

দয়ী মাথা নেড়ে বলে, ভাংচি-টাংচি সেকেলে ব্যাপার। যে লোকটির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে সে অনেক বেশি মডার্ন। আমার জামাইবাবুর সম্পর্কে ভাই। তার সঙ্গে যাতে আমার বিয়েটা না হয় সেজন্য জামাইবাবু যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কোনও কাজ হয়নি। আমাকে লেখা মলয়ের একটা চিঠি পর্যন্ত জামাইবাবু তাকে দেখিয়েছেন। লোকটা তাতেও দমেনি। বিয়ে সে আমাকে করবেই।

তবে আটকাচ্ছে কোথায় দয়ী?

দয়ী অবাক হয়ে বলে, কোথাও আটকাচ্ছে না তো! বিয়েটাও খুব নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে। কিন্তু পুরুষদের আমি খুব চিনি রুকু। লোকটা বিয়ে করবে বটে কিন্তু তার কমপ্লেকস শুরু হবে বিয়ের পর থেকে। মলয়ের ব্যাপারটা সে খুব ভালভাবে জানে না। একটা প্রেমপত্র থেকে খুব বেশি কিছু আন্দাজ করাও সম্ভব নয়। স্পোর্টসম্যানের মতো সে তাই এখন ব্যাপারটা গায়ে মাখছে না। কিন্তু বিয়ের পর সামান্য খটাখটি লাগলেই তার মনে নানারকম কমপ্লেকস দেখা দেবে। জানতে চাইবে মলয়ের সঙ্গে আমার কতদূর কী হয়েছিল। লোকটা এমনিতে ভাল, কিন্তু ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল। কোনও কিছুকেই সাবলিমেট করতে জানে না।

রুকু নিজের কপাল টিপে ধরে বলে, ওঃ দয়ী, আমার বোকা মাথায় এই সব শক্ত কথা একদম ঢুকছে না। সরল করে বলো!

দয়ী হাসল। বলল, সোজা কথায় লোকটাকে বিয়ে করতে আমার ভয় হচ্ছে। আমেরিকা তো এখানে নয়। সেই দূর দেশে যদি কখনও আমার কান্না পায় তবে সম্পূর্ণ একা একা কাঁদতে হবে। কাউকে কিছু বলার থাকবে না। আমার বড় ভয় করছে রুকু।

রুকু মহান গলায় বলে, তার জন্য তুমিই দায়ী দয়ী। এখন কী করতে চাও?

সেইজন্যই তোমার কাছে আসা। বলো তো কী খবর? আজও বিনয়ের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ক্যালকাটা ক্লাবে ওর এক বন্ধু পার্টি দিচ্ছে। রোজই আমরা একটু একটু করে আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ আসছি। এই সময়টাই সবচেয়ে বিপজ্জনক।

রুকু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবে। তারপর বলে, ভবিষ্যতে কী হবে তা কেই বা জানে? আমি বলি তুমি বরং লোকটাকে বিয়ে করে আমেরিকাতেই চলে যাও। হয়তো লোকটা সবই ক্ষমা করে নেবে।

দয়ী মাথা নেড়ে ঝুঁকে স্টিয়ারিং হুইলে মাথাটা নামিয়ে রাখে। মৃদুস্বরে বলে, জামাইবাবুও ওর কানে অনেক বিষ ঢেলেছে তো। যতদূর খবর পেয়েছি জামাইবাবু মলয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। বিনয়ের মুখোমুখি ওকে দাঁড় করাবে। অবশ্য তাতেও বিয়ে আটকাবে না আমি জানি। বিনয় অসম্ভব গোঁয়ার। কিন্তু বিষটা থেকে যাবে যে রুকু।

॥ দয়ী ॥

বিনয় খুব সামান্যই মদ খায়। সিগারেটেও তার তেমন নেশা নেই। তার আসল নেশা হল কাজ। পার্টি শেষ হল রাত দশটা নাগাদ। পার্টিতে আজ তেমন হুল্লোড় ছিল না, লোকজনও ছিল কম। মদের ঢল নামেনি, মাতলামির বাড়াবাড়ি হয়নি। যে আজ পার্টি দিয়েছিল বিনয়ের সেই বন্ধু অজিত ঘোষ দয়ীর হাতে এক গ্লাস শেরি ধরিয়ে দিয়েছিল। সেটাতে একটা বা দুটো চুমুক হয়তো দিয়েছিল দয়ী, এমন সময় বিনয় খুব নিরীহভাবে কাছে এসে তার কানে অস্ফুট কী একটু বলে হাত থেকে সুকৌশলে গ্লাসটা নিয়ে এক গ্লাস সফট ড্রিংক ধরিয়ে দিয়ে গেল। অবাক হলেও দয়ী প্রতিবাদও করেনি। সামান্য একটু অপমান অবশ্য বোধ করেছিল সে। কচি খুকি তো সে নয় যে, অন্য কেউ তাকে ইচ্ছেমতো চালাবে। মনটা বিরূপ ছিল বলেই বাদবাকি সময়টা সে পার্টির আনন্দটুকু মোটেই উপভোগ করেনি। দায়সারা কথাবার্তা বলল, একটা মাত্র মুরগির ঠ্যাং নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে রেখে দিল।

পার্টি শেষ হলে দয়ীর গাড়িতেই এসে উঠল বিনয়। ওঠার কথা নয়। কারণ বিনয় দয়ীর উলটোদিকে থাকে। নর্থে। বিনয় খুব নরম গলায় বলল, অনেকটা রাত হয়েছে। এত রাত্রে তোমাকে একা যেতে দেওয়া ঠিক নয়। আমি তোমার বাড়ির কাছ পর্যন্ত গিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরব।

দয়ী ভ্রু কুঁচকে বলল, আমার বেশি রাতে ফেরা অভ্যাস আছে।

কথাটা বলে দয়ী অপেক্ষা করল। কিন্তু বিনয় গাড়ি থেকে নামার লক্ষণ দেখাল না। দয়ী তাই গাড়ি চালু করে বলে, কলকাতা শহরে কিন্তু ইচ্ছেমতো ট্যাক্সি পাওয়া যায় না।

বাস আছে।— বিনয় শান্ত স্বরে বলে, না হয় কিছু একটা ঠিক জুটে যাবে।

আমার কোনও পাহারাদারের দরকার নেই। একা আমি বেশ চলতে পারি।

বিনয়ের মুখে হাসি নেই, গাম্ভীর্যও নেই। কথা একটু কম বলে। চুপচাপ নির্লজ্জের মতো বসে রয়েছে। দয়ী ভবানীপুর পর্যন্ত চলে এল বিনা সংলাপে। তারপর বিনয় হঠাৎ বলল, আমি পিউরিটান নই। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কেউ মদ খেলে আমার ভাল লাগে না। তুমি কিছু মাইন্ড করলে নাকি?

দয়ী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, ভাল মন্দ বুঝবার বয়স আমার হয়েছে।

বিনয় মৃদুস্বরে বলে, আই অ্যাম সরি। আমি ভাবলাম, অতটা শেরি খেয়ে গাড়ি চালাতে তোমার কষ্ট হবে। তাছাড়া এই গরমে কোনওরকম অ্যালকোহলই শরীরের পক্ষে স্বস্তিকর নয়।

আমি মোটেই অতটা খেতাম না। গাড়ি চালাতে হবে সেটা কি আমার খেয়াল ছিল না?-ভদ্রলোক দিলেন, ভদ্রতা করে নিতে হয় বলে নিলাম। খেতাম না।

ব্যাপারটা ভুলে যাও দয়ী। আমার ভুল হয়েছিল।

দয়ী কিছুটা স্বস্তিবোধ করে। লোকটাকে তার কখনও খারাপ লাগেনি। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। সে বলল, সারাজীবন একসঙ্গে থাকতে গেলে আগে থেকেই একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া থাকা ভাল বিনয়।

বিনয় একটা শ্বাস ফেলে বলে, আগে থেকে কখনও কোনও বোঝাপড়া হয় না। বোঝাপড়ার জন্যই তো একসঙ্গে থাকা।

দয়ী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আমি ডোমিনেটিং হাজব্যান্ড পছন্দ করি না।

বিনয় সামান্য হাসল। বলল, আমাকে গত দশদিনে কি তোমার তাই মনে হল?

দয়ী মাথা নেড়ে বলে, তা নয়। আমি আমার কথা বলছি।

বলার মতো কিছু তো ঘটেনি। শেরির গ্লাসটাকে তুমি এখনও ভোলোনি দেখছি।

দয়ী থমথমে গলায় বলল, পার্টিতে কেউ কেউ হয়তো ব্যাপারটা লক্ষ করেছে। তারা ধরে নিয়েছে, তুমি আমাকে নভিস হিসেবে গাইডেন্স দিচ্ছ।

ওরকম আর হবে না, কথা দিচ্ছি।

দয়ী হঠাৎ কালীঘাট পার্কের কাছে গাড়ি পার্ক করল। মুখ ফিরিয়ে বিনয়ের দিকে চেয়ে বলল, তুমি আমার সবকিছুই মেনে নিচ্ছ কেন বলো তো?

বিনয় একটু থতমত খেয়ে বলে, সেটা কি দোষের?

দয়ী মাথা নেড়ে বলে, দোষের নয়। বরং খুবই উদারতার পরিচয়। কিন্তু আমার কিছু প্রশ্ন আছে বিনয়। আমার জামাইবাবু কি তোমাকে আমার সম্বন্ধে অনেক খারাপ কথা বলেনি?

বিনয় ভ্রু কুঁচকে চিন্তান্বিত মুখে খুব ধীর হাতে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, ওটা নিয়ে তুমি অনর্থক চিন্তা কোরো না। বুধোদা আগে যেমন ছিল এখন আর তেমন নেই। টোটাল ফ্রাস্ট্রেশন থেকে মানুষ কতটা অন্যরকম হয়ে যায় তা আমি জীবনে কম দেখিনি। তাই বুধোদার কথার আমি মূল্য দিই না।

কথাটা বলে বিনয় অকপটে দয়ীর দিকে তাকায় এবং অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বয়স্ক মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে বলে, বয়সে তুমি আমার চেয়ে অনেকটাই ছোট। তোমার বয়সকে তো কিছুটা কনসেশন দিতেই হবে। বুধোদা সেটা না মানলেও আমি মানি।

দয়ী বিরক্তির সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, ওটা মার্কিন মানসিকতার কথা।

বিনয় ধীর স্বরে বলে, ধরতে গেলে আমি তো একজন মার্কিনই।

বলে সে খুব সুন্দর হাসি হাসে। বিশুদ্ধ আনন্দের হাসি।

দয়ী চোখ নামায় না। স্থির দৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে চেয়ে বলে, দিদির কাছে শুনলাম জামাইবাবু নাকি মলয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তার সঙ্গে তোমার একটা ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। তুমি কি মলয়ের সঙ্গে দেখা করবে?

বিনয়ও চোখ সরাল না। বলল, দেখা করা বা না করায় কোনও অর্থ নেই। তুমি না চাইলে দেখা করব না। চাইলে করব। কিন্তু দেখা করলেও আমার সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না।

সে আমি জানি। কিন্তু তুমি একথা মনে কোরো না যে, আমি বিয়ের জন্য বা আমেরিকায় যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে আছি। আমার কাছে ওগুলো কোনও ফ্যাক্টর নয়।

আমি তা মনে করি না।

দয়ী কী যে বলতে চাইছে তা সে নিজেই ভাল বুঝতে পারছিল না। মাথাটায় কেমন ওলট-পালট। বুকে কেমন রাগ আর অভিমানের ঝড়। সামনের রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে সে চুপ করে বসে রইল। সহজে কখনও তার কান্না আসে না। আজ আসছিল। প্রাণপণে সে কান্নাটাকে চাপবার চেষ্টা করছিল।

বাঁদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে নিবিষ্টমনে প্রায় অন্ধকার পার্কটার দিকে চেয়ে ছিল বিনয়। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, পার্কে ওরা কারা বসে আছে বলো তো? অনেকগুলো কাপল দেখছি। প্রেমিক-প্রেমিকা নাকি?

দয়ী মৃদু একটু হুঁ দিল।

বিনয় বলল, এত রাত পর্যন্ত কী অত কথা ওদের?

দয়ী হেসে বলে, তুমি তো প্রেমে পড়োনি। পড়লে বুঝতে।

বিনয় একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, সে কথা ঠিক। তবে কিনা আমেরিকায় এত ফালতু সময় কারও হাতেই থাকে না। কলকাতায় তোমরা বড় বেশি সময় নষ্ট করো দেখেছি। পাঁচটা মিনিট সময়ও যে কত মূল্যবান তা কলকাতার লোক বুঝবেই না।

গত দশদিনে বিনয় এই প্রথম আমেরিকার কথা তুলল। অন্যসব বাঙালি ছেলে বিদেশ ঘুরে এসে যে বিদেশি গল্পের ঝুড়ি খুলে বসে বিনয় সেরকম নয় মোটেই। আমেরিকা নিয়ে দয়ীকে সে কোনওদিনই জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করেনি।

বিনয় হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলে, সময়ের মূল্য তুমিও খুব একটা বোঝো না দয়ী। গাড়ি দাঁড় করিয়ে শামোখা রাত বাড়াচ্ছো।

দয়ী গাড়ি চালু করল। বলল, তুমি সত্যিই আমাদের বাড়ি পর্যন্ত যাবে?

আর একটু যাই। ফাঁড়িতে নামিয়ে দিও।

মলয়ের সঙ্গে তোমার কবে দেখা হবে?

বিনয় শব্দ করে হাসল। বলল, অবসেশনটা কাটিয়ে ওঠো দয়ী। দেখা হলেও কিছু নয়, না হলেও কিছু নয়।

আমাকে তবে তুমি বিয়ে করবেই?

তুমি রাজি থাকলে।

কোনও কিছুতেই আটকাবে না?

বিনয় মৃদু হেসে বলে, আমি অদৃষ্টবাদী। আটকাবে না তা কী করে বলি? কত অঘটন আছে।

কেন তুমি আমাকেই বিয়ে করতে চাও? তুমি তো আমার প্রেমে পড়োনি।

বিনয় মাথা নেড়ে বলে, না। প্রেমে পড়া অ্যাডোলেসেন্ট মানসিকতা। আমি তা কাটিয়ে উঠেছি। তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হল কমপ্যাটিবিলিটি। এই বয়সে অনেক ডেবিট ক্রেডিট কষে তবে বিয়ের মতো গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

আমাকে নিয়ে তুমি হিসেব নিকেশ করছ?

হুঁ! রেজাল্টটা খারাপ নাও হতে পারে।

তুমি কীরকম মেয়ে চেয়েছিলে?

তোমার মতো।

ভেঙে বলো।

ধরো, যে-মেয়ে অচেনা পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবে, অতি দ্রুত জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে, যে মোটামুটি বুদ্ধিমতী এবং সাহসী।

আর কিছু নয়?

বিনয় হেসে বলে, বয়স যখন অল্প ছিল তখন আরও অনেক বেশি চাইতাম। দারুণ সুন্দরী, বিমুগ্ধ

প্রেমিকা, কট্টর সতী। অভিজ্ঞতা বাড়ার পর আর স্বপ্ন দেখি না।

তুমি কখনও কারও প্রেমে পড়োনি?

একাধিকবার।— বলে কৌতুকে মিটমিটে চোখে বিনয় দয়ীর দিকে চেয়ে বলে, কিন্তু এসব আজ কী জিজ্ঞেস করছ তুমি দয়ী? আজ কি তুমি খুব নার্ভাস? এসব তো তোমার প্রশ্ন নয়।

দয়ী দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়। বাস্তবিক আজ তার মাথা বড় ওলট-পালট। বুকে অভিমানের ঝড়। আজ সে কিছুই তার নিজের মতো করছে না। এক অচেনা দয়ী আজ তার মাথায় ভর করেছে।

ফাঁড়িতে নেমে গেল বিনয়। রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ফুটপাথে। অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হল তাকে ট্যাক্সির জন্য। ততক্ষণ দয়ীও গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করল। ওপাশ থেকে বিনয় মাঝে মাঝে মৃদু হেসে হাত নাড়ছিল, এপাশ থেকে দয়ীও। কলকাতার এইসব মধ্যবিত্ত পাড়ায় এত রাতে দৃশ্যটা খুব নিরাপদ নয়। লোকে তাকাচ্ছিল, লক্ষ রাখছিল। অবশেষে বিনয় একটা ট্যাক্সি ধরতে পারল।

বাড়িতে ফিরতে রাত হলে দয়ীকে কিছু বলার কেউ নেই। ট্যারা বসন এখন পারতপক্ষে ছেলেমেয়েদের মুখোমুখি হতে চায় না। দয়ীর মা ছিল বড়লোকের ঘরে শিক্ষিতা মেয়ে। একটা অশিক্ষিত গুন্ডার প্রেমে পড়ার মাশুল দিচ্ছে সারাজীবন। অনেক চুরি, ডাকাতি, লোক ঠকানো, জুয়া, রক্তপাত দেখে কেমন অল্প বয়সেই বুড়িয়ে গেছে। এখন তার কিছু শুচিবাই এবং পুজোআর্চার বাতিক হয়েছে। মা নিজের মনে থাকে। কারও তেমন কোনও খবর নেয় না।

গ্যারাজে গাড়ি রেখে বাড়ি ঢুকতেই দয়ী দেখল, বৈঠকখানায় উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। বেশ একটু উঁচু স্বরে কথাবার্তা হচ্ছে ভিতরে। একটা গলা বাবার, অন্যটা সরিতের।

বহুকাল সরিৎ এ বাড়িতে আসে না। আজ কেন এসেছে সেটা আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না দয়ীর। সরিতের বা বাবার মুখোমুখি হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না দয়ীর। সে চুপি চুপি দোতলায় উঠে যেতে পারত। কিন্তু হল না পোষা অ্যালসেশিয়ানটার জন্য। দোতলার বারান্দা থেকে সেটা 'হাউফ হাউফ' করে প্রচণ্ড ধমক চমক শুরু করল।

বৈঠকখানা থেকে বাবার বুলেটের মতো স্বর ছিটকে এল, কে?

গেটে দারোয়ান থাকে, বাড়িতে কুকুর আছে, প্রচুর লোকজন, তবু ট্যারা বসন এখনও সন্দিহান, সতর্ক। এসব লোক জীবনে কখনও নিশ্চিন্তে সময় কাটাতে পারে না।

দয়ী খুব উদাস গলায় জবাব দিল, আমি দয়ী।

অ।— ট্যারা বসন যেন নিশ্চিন্ত হল। সরিতের গলা শোনা গেল, ওকে ডাকুন না। ডেকে সামনা-সামনি জেনে নিন।

ট্যারা বসন মৃদু স্বরে বলে, থাকগে। যেতে দাও। কাল সকালে বললেই হবে।

সরিৎ হঠাৎ ধমকে উঠে বলল, ইট মে বি টু লেট দেন। আপনার ছেলেমেয়েরা কে কী করবে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমাদের পরিবার ইনভলভড হলে আমি ছেড়ে কথা বলব না।

সিঁড়ির গোড়ায় দয়ী একটু দাঁড়াল। একবার ভাবল, ওপরে উঠে যাবে। তারপর খুব ঘেন্না হল পালিয়ে যেতে। সে আস্তে অত্যন্ত সতেজ পায়ে এগিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় বৈঠকখানার পরদাটা সরিয়ে ঢুকল।

কীভাবে সাজালে ভাল হবে তা বুঝতে না পেরে ট্যারা বসন বৈঠকখানাটাকে প্রায় একটা জাদুঘর বানিয়ে তুলেছে। বিশাল বিশাল কয়েকটা সোফা, মেঝেয় লাল নীল ফুলকাটা কার্পেট, সামনের দেয়ালে একটা হরিণের মাথার নীচে একটা ঢালের সঙ্গে দুটো ক্রশ করা তরোয়াল, পাশে ছোট্ট মাদুরের ওপর যামিনী রায়ের ঢঙে আঁকা ছবি, রবি ঠাকুরের কাস্টিং, অন্য দেয়ালে শিলং থেকে আনা ঘর সাজানো তিরধনুক, অন্তত গোটা ছয়েক ক্যালেন্ডার, ভোজালি, ক্রুশবিদ্ধ জিশুর মূর্তি

দেয়াল কুলুঙ্গিতে একটা গণেশ, ঢাউস বুককেসে রাজ্যের ইংরিজি বাংলা বই। ঘরে একই সঙ্গে চিনে লণ্ঠন, মস্ত ঘোমটার মতো ঢাকনা পরানো স্ট্যান্ডওলা আলো, স্টিক লাইট এবং মার্কারি ল্যাম্পের ব্যবস্থা। আছে পেতলের বিশাল ফুলদানি, পাথরের ন্যাংটো পরি, একটা কাশ্মীরি কাঠের জালিকাটা পার্টিশন পর্যন্ত। কী ভেবে বৈঠকখানার এক কোণে একটা নীলচে রঙের হাল-ফ্যাশানের মুখ ধোওয়ার বেসিন পর্যন্ত লাগিয়েছে বসন। পারতপক্ষে এ ঘরে দয়ী বা তার ভাইবোনেরা ঢোকে না। তাদের আলাদা আড্ডাঘর আছে। এ ঘরে সভা শোভন করে বসনই বসে রোজ।

আগে চেককাটা লুঙ্গি পরত, আজকাল সাদা পায়জামা পরার অভ্যাস করেছে ট্যারা বসন। গায়ে মলমলের পাঞ্জাবি লেপটে আছে। একটু আগেও বোধহয় লোডশেডিং ছিল। ঘরে নেভানো মোমের পোড়া গন্ধ। ট্যারা বসনের মলমলের পাঞ্জাবি এখনও ঘামে ভেজা। খোলা বুকে সোনার চেনে আঁটা বাঘের নখ। টকটকে লালচে ফরসা রং, মাথায় চুল পাতলা, মজবুত চেহারা। এখনও চোখের নজর যেন উড়ন্ত ছুরির মতো এসে বেঁধে। খুব গম্ভীরভাবে দয়ীর দিকে চাইল।

দয়ী কোনওদিনই বাপকে গ্রাহ্য করে না, আজও করল না। ট্যারা বসনের ডানদিকের মস্ত সোফায় সরিৎ বসা। তার চোখমুখ থমথম কছে। দয়ীর দিকে একবার চেয়েই অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে পেছনে হেলে ডোন্টকেয়ার ভঙ্গিতে মাথার চুলে আঙুল চালাতে লাগল। ঠোঁটে একটু বিদ্রুপের হাসি।

দয়ী ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেও প্রথমটায় কথা বলতে পারল না। রাগে শরীর কাঁপছিল। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল মাথা। বড় বড় চোখে খানিকক্ষণ সরিতের দিকে চেয়ে রইল। তারপর পাড়া-জানানো তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমি কাউকে বিয়ে করতে চাই না। আপনি যান, গিয়ে আপনার ভাইয়ের কান বসে বসে ভারী করুন গে। এতদিন তো তাই করছিলেন, সুবিধে হয়নি বুঝে কি আজ এ বাড়িতে হানা দিয়েছেন?

সরিৎ বোধহয় এতটা আশা করেনি। দয়ীর চিল-চেঁচানি শুনে বোধহয় খানিকটা নার্ভাস হয়ে গেল। তোম্বা মুখ করে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

কিন্তু দয়ীর মাথার ঠিক নেই। সে প্রাণপণে চিৎকার করে বলছিল, লজ্জা করে না আপনার? দিদিকে সারাটা জীবন স্লো পয়জন করে যাচ্ছেন। নিজের ছেলেকে দিয়ে আমার গোপন চিঠি চুরি করাচ্ছেন। মেয়েমানুষের মতো চুকলি করে বেড়াচ্ছেন। আপনি কি ভাবেন আপনার ভাইয়ের মতো পাত্র আর হয় না, আর আমি জলে পড়েছি? আমাদের ভাল-মন্দ বোঝবার জন্য আমার বাবা মা আছে, আপনি গার্জিয়ানি ফলাতে আসেন কেন? মর‍্যালিটি গিয়ে নিজের ছেলেকে শেখান আর বউকে গিয়ে বীরত্ব দেখান।

বলতে বলতে দয়ী উদভ্রান্তের মতো গিয়ে সেন্টার টেবিল থেকে পেতলের ছাইদানিটা তুলে নিল হাতে। তারপর সেটা মাথার ওপর তুলে আক্রোশে বীভৎস চেরা গলায় চেঁচাল, যান, এক্ষুনি বেরিয়ে যান। নইলে শেষ করে ফেলব।

চারদিক থেকে পায়ের শব্দ ছুটে আসছিল, টের পায়নি দয়ী। মুহূর্তে ঘর ভিড়ে ভিড়াক্কার। বহুকাল বাদে ট্যারা বসন তার শারীরিক সক্ষমতার পরিচয় দিল এক লাফে উঠে দয়ীর হাত থেকে দ্রুত হাতে অ্যাশট্রেটা ছিনিয়ে নিয়ে। তারপর জামাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, এইসব লুম্পেনভুম্পে আমার ভাল লাগে না। রাত হয়েছে, তুমি বাড়ি যাও।

সরিৎ গুম হয়ে বসে অপমানটা হজম করার চেষ্টা করছিল।

বাড়ির লোকেরা দয়ীকে টেনে নিয়ে গেল অন্দরমহলে। ভারী ক্লান্তবোধ করছিল দয়ী। ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। মাথাটা আজ বড় ওলট-পালট। আজ দয়ী আর দয়ী নেই।

BDeBooks.com

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com